অক্টোবর ২০২০ ▪ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বিশ্ব শিশু দিবস এবং অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল

বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– প্রণব মুখার্জি

পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

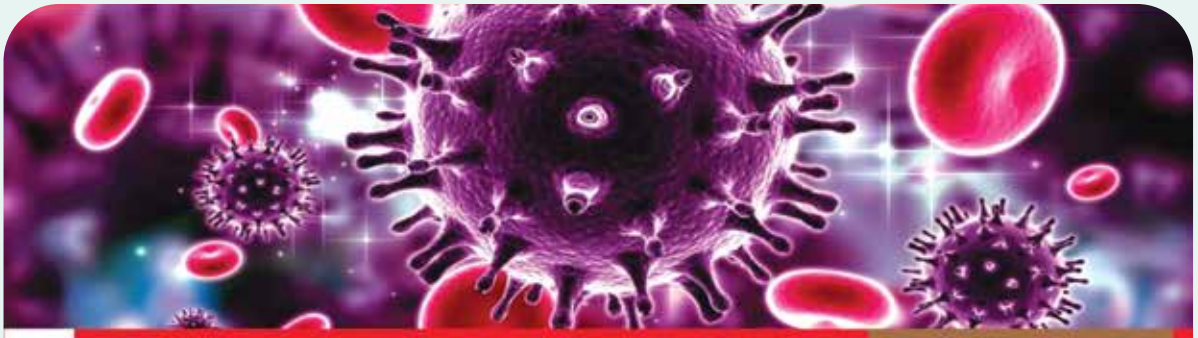

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন : সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২০ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২০ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে উচ্চস্তরের ভার্চুয়াল ইভেন্ট 'Digital Cooperation: Action Today for Future Generations'-এ বক্তব্য প্রদান করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২০ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে ভাষণ দেন। করোনা পরিস্থিতির বিষয় তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশা করা হচ্ছে, বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন পাবে। রোহিঙ্গা সমস্যা মিয়ানমারের সৃষ্টি। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের প্রতি নৃশংসতা ও অমানবিকতার চিত্র তুলে ধরে এর স্থায়ী সমাধানের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। জলবায়ুসহ একাধিক আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সফলতা, এসডিজি বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, মাদক চোরাচালান বন্ধ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সুশাসন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন তাঁর ভাষণে। পাঠকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর। অক্টোবরে বিশ্ব শিশু দিবস এবং কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। ছোট্ট রাসেলও ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালরাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। শিশু অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। শিশু শেখ রাসেল তাই অধিকারহারা মানবাধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক। তাকে নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি পাহাড়ি জনগণের বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। চুক্তির পরে পার্বত্যাঞ্চল জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ বেগবান হয়েছে। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রয়াসের কারণে তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়ে রয়েছে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এ মাসে পালিত আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস নিয়েও রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* অক্টোবর ২০২০ সংখ্যাটি।

আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪
বিশ্ব শিশু দিবস এবং অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল ৮
খালেক বিন জয়েনউদদীন
বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– প্রণব মুখার্জি ১০
রেহানা শাহনাজ
পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে ১২
সানিয়াত রহমান
ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মোংলা বন্দর ১৫
ম. জাভেদ ইকবাল
সচল হয়ে উঠছে অর্থনীতি ১৬
সৈয়দ শাহরিয়ার
বঙ্গবন্ধুর ব্যাংকিং ভাবনা ১৭
হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ২০
প্রভাষ চন্দ্র
বকুল তলায় শরৎ রানি ২২
জাকির আবু জাফর
মধুমতীর খোকা ২৩
ইমরুল কায়েস
দুর্যোগ প্রশমনে সরকার ২৫
সোমা চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ২৭
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন
ছয় দফা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গবন্ধু ২৯
কে সি বি তপু
পোলিও টিকায় রোল মডেল বাংলাদেশ ৩১
নাজনীন সুলতানা
খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য আইন ৩৩
সুষমা ফাল্গুনী
করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য ৩৫
তারিকুল হাসান
প্রবীণ দিবস ও বাংলাদেশের প্রবীণ ৩৭
রবিউল ইসলাম
কন্যাশিশুর সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ ৩৮
মো. আলী নূর
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য ৩৯
সাবিহা সুলতানা
স্তন ক্যানসার: সচেতন হই জীবন বাঁচাই ৪০
কেকা আহমেদ

হাইলাইটস

গল্প

শেখ রাসেলের সবুজ খাতা ৪১
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৩, ৪৪, ৪৫

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, দেলওয়ার বিন রশিদ
শাফিকুর রাহী, শাহরিয়ার নূরী, প্রত্যয় জসীম
খান চমন-ই-এলাহি, শাহনাজ, আল মামুন
মো. জসিম উদ্দিন, সাদিয়া সুলতানা, গোলাম নবী পান্না
রাবেয়া নূর, বশিরুজ্জামান বশির, ফরিদ আহমেদ হৃদয়
মুহাম্মদ ইসমাঈল, রুস্তম আলী, মো. হযরত আলী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
শিক্ষা ৫২
বিনিয়োগ ৫৩
নারী ৫৩
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৪
কৃষি ৫৫
বিদ্যুৎ ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
কর্মসংস্থান ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
যোগাযোগ ৫৮
চলচ্চিত্র ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩

চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী ৬৪
আফরোজা রুমা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে মানব ইতিহাসের এক অভাবনীয় দুঃসময় অতিক্রম করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন– বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন পাবে। এই ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশ যাতে এই ভ্যাকসিন সময়মতো এবং একইসঙ্গে পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ভাষণে তিনি এই মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্যও তুলে ধরেন। এছাড়া এ ভাষণে রয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য বিষয়েও সফলতার ইঙ্গিত। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

বিশ্ব শিশু দিবস এবং অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস। শিশু দিবসের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে জাতির পিতার কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করে। পঁচাত্তর সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হন। সে সময়ই রাসেল বাঁচার জন্য কাকুতিমিনতি করলেও তাকে হত্যা করে বিপথগামী কতিপয় সেনাসদস্য। শেখ রাসেল অধিকার হারা এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত শিশুদের প্রতীক ও প্রতিনিধি হয়ে বেঁচে থাকবে। এ বিষয়ে 'বিশ্ব শিশু দিবস এবং অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা–৮

বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– প্রণব মুখার্জি

বাংলাদেশের বন্ধু ছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ প্রণব মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সূচনা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে ভারতের সমর্থন দানের জন্য ভারতের রাজ্যসভায় তিনি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারকে আগলে রেখেছিলেন এই মহান রাজনীতিবিদ। তিনি ৩১শে আগস্ট পরলোক গমন করেন। এই মহান নেতার মৃত্যুতে ভারত সাত দিন ও বাংলাদেশ একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করে। তাঁর সম্পর্কে 'বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– প্রণব মুখার্জি' শীর্ষক একটি নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১০

পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' নামে বিশেষ পরিচিত। এর স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে অনেক উন্নত হয়েছে। এ বিষয়ে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (ইউএনজিএ)-এর ৭৫তম অধিবেশনের জেনারেল ডিবেট সেশনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমরা মানব ইতিহাসের এক অভাবনীয় দুঃসময় অতিক্রম করছি। জাতিসংঘের ইতিহাসেও এই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের সদর দপ্তরে সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণের অনুপস্থিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের এই সভাকক্ষটি আমার জন্য অত্যন্ত আবেগের। ১৯৭৪ সালে এই কক্ষে দাঁড়িয়ে আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে মাতৃভাষা বাংলায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। আমিও এই কক্ষে এর আগে ১৬ বার সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিশ্বশান্তি ও সৌহার্দ্যের ডাক দিয়েছি। সরকারপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এটি আমার ১৭তম বক্তৃতা।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্বাস্থ্যকর্মীসহ সকল পর্যায়ের জনসেবকদের যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন। সাধুবাদ জানাই জাতিসংঘ মহাসচিবকে এই দুর্যোগকালে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের জন্য। বাংলাদেশ শুরু থেকেই যুদ্ধবিরতিসহ তাঁর অন্যান্য উদ্যোগসমূহকে সমর্থন জানিয়ে আসছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন জাতিসংঘ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের উপর গুরুত্বারোপের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই মহামারি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। তাঁরই দেখানো পথে হেঁটে আমরা আজ বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল আসনে নিয়ে আসতে পেরেছি। এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের জনগণের আদর্শ এবং এই আদর্শের জন্য তাঁরা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে।'

তাঁর এই দৃপ্ত ঘোষণা ছিল মূলত বহুপাক্ষিকতাবাদেরই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তাঁর প্রদত্ত দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য বর্তমান সংকট মোকাবিলার জন্য আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে '১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলায় ভাষণ' স্মরণে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

বাঙালি জাতির জন্য এ বছরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর আমরা আমাদের জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। বঙ্গবন্ধুর জীবন, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং সাফল্য আমাদের কোভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যেমন সাহস জোগায়, তেমনি সংকটের উত্তরণ ঘটিয়ে নূতন দিনের আশার সঞ্চার করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সকল বঞ্চিত ও উন্নয়নকামী দেশ ও মানুষের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার আমার পিতা এবং বাঙালি জাতির পিতা, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার মা, আমার তিন ভাই, দুই ভাতৃবধূসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। আমরা দুই বোন দেশের বাইরে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। শরণার্থী হিসেবে আমাদের ৬ বছর দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে। আমি জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি এ জন্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম জঘন্য, নির্মম ও বেআইনি হত্যাকাণ্ড যেন আর না ঘটে।

জনাব সভাপতি,

কোভিড-১৯ প্রমাণ করেছে, আমাদের সকলের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। আমরা কেউই সুরক্ষিত নই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছি। এই ভাইরাস আমাদের অনেকটাই ঘরবন্দি করে ফেলেছিল। যার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮.২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ আমাদের এই অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করেছে।

তবে বাংলাদেশে আমরা প্রথম থেকেই 'জীবন ও জীবিকা' দুই ক্ষেত্রেই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য, উৎপাদন যাতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, তার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছি।

দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা প্রতি বছর প্রায় ৩৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করি। এছাড়া বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণিসহ অন্যদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও ভাতার প্রচলন করেছি, যার মাধ্যমে প্রায় ৯.১ মিলিয়ন পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ বিস্তারের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের জন্য আমরা তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে ১০ মিলিয়নের বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে। আমরা ৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছি। করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, শ্রমিক ও দিনমজুরসহ ৫ মিলিয়ন মানুষকে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়েছি। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ের প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়।

সরকারি সহায়তার পাশাপাশি আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তহবিল সংগ্রহ করে এতিম ও গরিব শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, স্কুল শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ যাঁরা সাধারণভাবে সরকারি সহায়তার আওতাভুক্ত নন, তাঁদের মধ্যে ২.৫ বিলিয়নের বেশি টাকা বিতরণ করি। যার ফলে সাধারণ মানুষকে করোনা ভাইরাস খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

কোভিড-১৯ রোগী শনাক্তের সাথে সাথে আমরা ৩১-দফা নির্দেশনা জারি করেছিলাম। করোনা ভাইরাস যাতে ব্যাপকহারে সংক্রমিত হতে না পারে, তার জন্য আমরা সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছি। যার সুফল হিসেবে আমরা লক্ষ করছি, ঋতু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, এবার সেসব রোগ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না।

আর্থিক খাতের আশু সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে আমরা ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করি। রপ্তানিমুখী শিল্প, শ্রমিকদের সুরক্ষা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধিতে ঋণ প্রদান, কৃষি ও কৃষকদের সহায়তা, কর্মসৃজনের জন্য ঋণ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানের সুদ মওকুফ, পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বীমা চালুকরণ ইত্যাদি খাত প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা মোট ১৩.২৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই মার্চ ২০২০ ঢাকায় গণভবন থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অভিন্ন কৌশল গ্রহণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা আমাদের মোট জিডিপি'র ৪ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

আমরা করোনাকালে খাদ্য উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। সেই সঙ্গে পুষ্টি নিশ্চয়তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের শিল্প কারখানা সচল রাখা এবং কৃষি ও শিল্পপণ্য যথাযথভাবে বাজারজাতকরণের বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। যার ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি এখনো তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো আছে।

কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে স্থবিরতা সত্ত্বেও আমাদের ৫.২৪ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

জনাব সভাপতি,

আশা করা হচ্ছে, বিশ্ব শিগগিরই কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন পাবে। এই ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল দেশ যাতে এই ভ্যাকসিন সময়মতো এবং একইসঙ্গে পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিগরি জ্ঞান ও মেধাস্বত্ব প্রদান করা হলে, এই ভ্যাকসিন বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে।

মহামারি নিরসনে আমাদের উদ্যোগ এবং এজেন্ডা-২০৩০ অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টা সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় Voluntary National Review রিপোর্ট উপস্থাপন প্রমাণ করে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আমরা যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছি।

বাংলাদেশকে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বদ্বীপে পরিণত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রযুক্তিগত বিভাজন নিরসন, সম্পদ আহরণ ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। পাশাপাশি স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল এবং সদ্য উত্তরিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এই আপদকালীন, উত্তরণকাল ও উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাসী শ্রমিকগণ স্বাগতিক ও নিজ দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রেখে চলেছেন। এই মহামারির কারণে অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। অনেককে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেশে ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের প্রণোদনা বাবদ ৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছি। তবে কোভিড পরবর্তী সময়ে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়টি সহমর্মিতার সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর বিদ্যমান সমস্যাসমূহ প্রতিনিয়ত প্রকট হচ্ছে। এই সংকটকালেও আমাদের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। CVF ও V-20 Group of Ministers of Finance-এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু সমস্যা উত্তরণে একটি টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এছাড়াও গ্লাসগো Conference of Parties (COP)-এ গঠনমূলক ও কার্যকর ফলাফল নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে Beijing Declaration and Platform of Action কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই ঘোষণার ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনকালে ঘোষণায় উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নে আমাদের দৃঢ় সংকল্প ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে আমরা লিঙ্গ বৈষম্য সামগ্রিকভাবে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ কমিয়ে এনেছি। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মূলে রয়েছে নারীদের অবদান। মহামারি মোকাবিলাসহ সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশের নারীরা সামনে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে আমরা শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ইউনিসেফ-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া, কোভিড সংক্রান্ত সমস্যা যাতে শিশুদের সামগ্রিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল ২০২০ ঢাকায় গণভবনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব ও উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন –পিআইডি

সমস্যায় পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

জনাব সভাপতি,

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়'–এই নীতিবাক্য আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে।

মহামারিকালে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলোর মোকাবিলা করতে পারি।

শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সংঘাতপ্রবণ দেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে আমাদের শান্তিরক্ষীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যতম দায়িত্ব।

এ বছর আমরা Women, Peace and Security এজেন্ডা-এর ২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছি। এই এজেন্ডার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তায় নারীর ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

শান্তির প্রতি অবিচল থেকে আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি। মহামারির ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অপরিহার্য।

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণে বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের সমর্থন অবিচল। সে বিবেচনা থেকে পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের কার্যক্রমকে আমরা জোর সমর্থন জানাই।

জনাব সভাপতি,

আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালি জাতি অবর্ণনীয় দুর্দশা, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধের শিকার হয়েছে। সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছি।

বাংলাদেশ ১১ লাখেরও বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয় প্রদান করেছে। তিন বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত মিয়ানমার একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি। এই সমস্যা মিয়ানমারের সৃষ্টি এবং এর সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে। আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে আরো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিদ্যমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ আরো প্রকট হয়েছে। এ মহামারি আমাদের উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে যে, এ সংকট উত্তরণে বহুপাক্ষিকতাবাদের বিকল্প নেই। জাতিসংঘের ৭৫তম বছর পূর্তিতে জাতিসংঘ সনদে অন্তর্নিহিত বহুপাক্ষিকতাবাদের প্রতি আমাদের অগাধ আস্থা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বহুপাক্ষিকতাবাদের আদর্শ সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

পাশাপাশি আমরা আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সে সোনার বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত– যেখানে সবার মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে জাতি ও বিশ্বের নিকট এটিই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিশ্ব শিশু দিবস এবং অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল

খালেক বিন জয়েনউদদীন

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করা জাতিসংঘের শিশু সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোতে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবারের বিশ্ব শিশু দিবসের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্ব শিশু দিবসের মতো আমাদের দেশে আরো একটি দিন আনন্দঘন পরিবেশে পালন করা হয়। সেই দিনটি হলো ১৭ই মার্চ 'জাতীয় শিশু দিবস'। এই দিনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এদিন আমাদের শিশুরা নানা কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো– গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী শিশুর শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করা। বৃহত্তর অর্থে শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আবাসন তথা সকল প্রকার অধিকার সুরক্ষা করা। আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং যোগসূত্র এই যে, শিশু দিবসের মাসে ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতার কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করে। একারণেই শেখ রাসেল অক্টোবরের জাতক। শিশু দিবসের মাসে তার জন্মদিন খুশি ও আনন্দ বয়ে আনে।

বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। আন্তর্জাতিকভাবে নানা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। যেমন– বাঙালির মাতৃভাষা আন্দোলন ও ভাষার গুরুত্বকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের আহ্বানে গোটা বিশ্বে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তেমনি বিশ্ব শিশু দিবস। শিশু অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ প্রথম মহাযুদ্ধের পর অধিক সচেতন হয়। ১৯১৯ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে নারী ও শিশুর মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের মানুষ হতবাক হন এবং বিবেকবান মানুষ মৃত্যু ঠেকাতে ও শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে একটি সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দাপটে তা কার্যকর হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারী ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দেখে আবারো বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে পড়ে। জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মিছিলে শিশু-কিশোরই ছিল সংখ্যায় অধিক। শুধু যুদ্ধই নয়, যুদ্ধের মতো সকল দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে শিশুর প্রাণ হারাতে হয়। আবার শিশু-কিশোরদের অনেক ক্ষেত্রে অমানবিকভাবে হত্যা করে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শিশুর মৃত্যুর হার দেখে সভ্য মানুষেরা ১৯৫৪ সালে সমবেত হয়ে শিশুদের মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করতে পারেনি। বিশ্বের পরমাণু বোমার অধিকারী শক্তিগুলো তালবাহানা করে। ফলে সিদ্ধান্তগুলো আবার আটকে যায়। শেষমেষ ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্তসমূহ 'শিশু অধিকার সনদ' নামে গৃহীত হয় এবং সনদে জাতিসংঘের প্রায় সকল সদস্যই স্বাক্ষর করে এবং প্রতিজ্ঞা করে শিশুর বেঁচে থাকা অর্থাৎ বিকশিত হওয়ার অধিকারগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এবং প্রতিবছর শিশুদের অস্তিত্বকে জানান দেবার লক্ষ্যে একটি বিশেষ দিনে শুধু তাদের কথাই বলা হবে। সেই দিনটি অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার।

আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হবার অনেক পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর একান্ত আগ্রহে আমাদের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে শিশুর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি তিনি ১৯৭৪ সালে প্রবর্তন করেন শিশু আইন। পরবর্তীকালে সংবিধান ও শিশু আইনের আলোকে ২০১১ সালে জাতীয় শিশুনীতি ঘোষণা করে বর্তমান সরকার। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও শিশু বিকাশে এই সরকার শিশুবান্ধব। বছরের দুটি দিবসেই আমরা তা লক্ষ করি এবং শিশুর উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি থেকে শিশুদের জন্য যাবতীয় কর্মসূচি নিরন্তর বাস্তবায়ন করে চলেছে। কিন্তু বিশ্বে শিশু পরিস্থিতি কেমন? প্রতিবছর জাতিসংঘের ইউনিসেফ (শিশু তহবিল) তাবৎ বিশ্বের শিশু-কিশোরদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এসব রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিশুরা পূর্বের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, হানাহানিতে সবার আগে প্রাণ দেয়। ভিয়েতনামে যুদ্ধ, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ও লাতিন আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রাণ গেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রোশে।

পঁচাত্তর সালে আমরাই দেখলাম মানবতার সে-কী পরাজয়। নরঘাতকেরা সেই আগস্টের ১৫ তারিখে কামান, গোলা ও স্টেনগান নিয়ে বত্রিশের ছয়শ সাতাত্তর নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, ধানমন্ডির শেখ ফজলুল হক মণির বাড়ি, মন্ত্রীপাড়ায় মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি এবং মোহাম্মদপুরের শেরশাহসূরি রোডের বস্তিঘরে ১০/১২ জন শিশু-কিশোরকে অকাতরে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল, সুকান্ত বাবু, আরিফ, বেবী, রিন্টু ও মোহাম্মদপুরের শিশু নাসিমাও ছিল। আগস্টের এই শিশু-কিশোর হত্যা গোটা বিশ্বকে অবাক করে দেয়।

রাসেল একটি আবেগপ্রবণ সত্তা এবং শিশু অধিকার রক্ষার প্রতীক। তার বাঁচার অধিকারকে হত্যাকারীরা অভয় দিয়েও রক্ষা

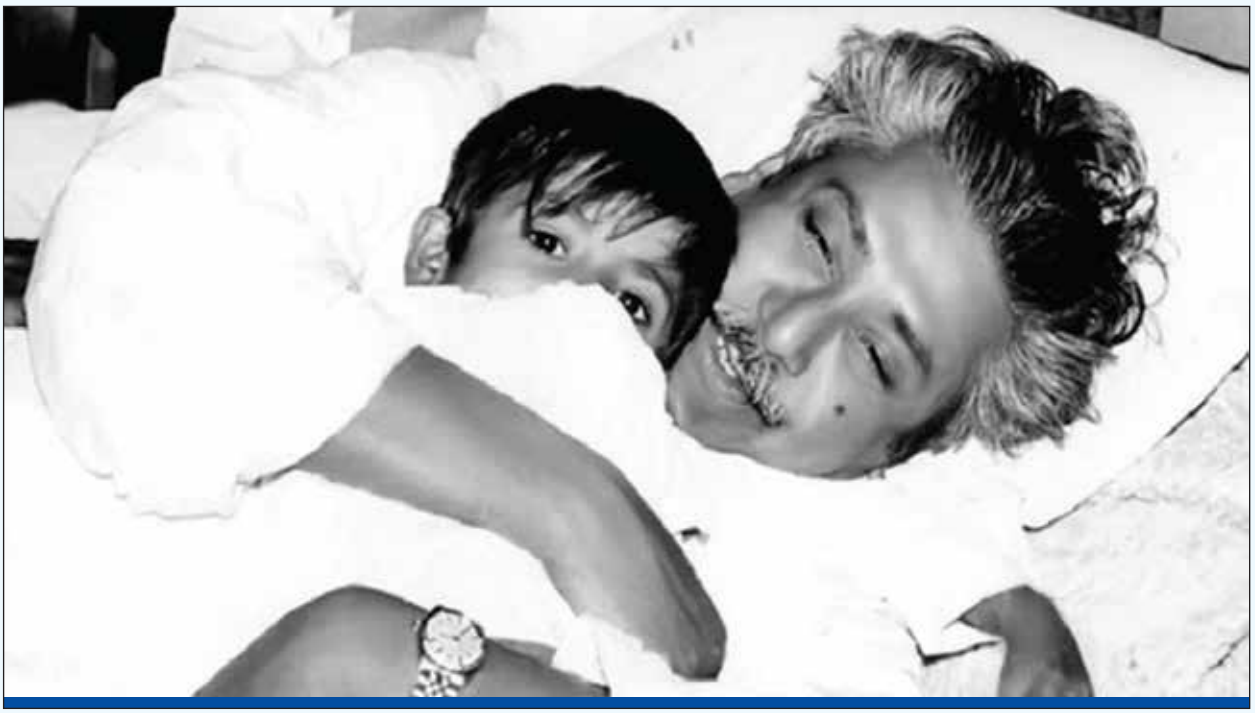

পিতার একান্ত সান্নিধ্যে শেখ রাসেল

করেনি। বেঁচে থাকার সে-কী অমোঘ ইচ্ছে। বাড়ির প্রায় সকলকেই মেরে ফেলা হয়েছে। তাকে মারা হবে না– এই অভয় দিয়ে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। সে সময়ই রাসেল বাঁচার জন্য কাকুতিমিনতি করেছিল। কিন্তু খুনিরা তার পরিচয় জেনেই ওপরে নিয়ে হত্যা করে। একারণেই রাসেল ও আগস্টে নিহত শিশুদের হত্যার বিষয়টি সমগ্র বাঙালির কাছে আবেগের শোকাহত উপলব্ধি। এদের কাছে মানবিক গুণ, মানবতা ও জাতিসংঘের শিশু সনদ এবং জাতীয় শিশুনীতিমালা অতি তুচ্ছ। এরা মানুষ নামের নরপশু, নরঘাতক ও নরপাষণ্ড। অক্টোবরের শিশু দিবস শিশুদের অধিকার রক্ষা যেমন– নিরাপত্তা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, আবাসন ও বিকাশের কথা শোনায়, তেমনি মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে এবং শিশু বিকাশে সহায়তা করে। সেই অক্টোবরের জাতককেই হত্যা করা হয় অন্যদের সঙ্গে। এখানেই অক্টোবরের জন্ম নেওয়া রাসেলের সঙ্গে লৌকিক যোগসূত্র।

শেখ রাসেলের প্রকৃত নাম শেখ রিসাল উদ্দিন। ডাক নাম রাসেল। বঙ্গবন্ধু বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামে নামটি রাখেন। রাসেল মাত্র দশ বছর দশ মাস বেঁচে ছিল। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। পড়াশোনা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলে। মাঝেমধ্যে সে গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় গেছে। সে একবার জাপান গেছে বাবার সঙ্গে। রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যও ভ্রমণ করেছে। বাড়ির প্রাঙ্গণ, বাড়ির সামনের রাস্তা ও ফুফুদের বাসাই ছিল তার বিচরণ ভূমি। একাত্তরে ছিল মায়ের সঙ্গে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে বেড়াতে এলে মা-বাবার সঙ্গে বিমানবন্দরে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল রাসেল। রাসেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল প্রতিবেশী আদিল ও ইমরান। সাইকেল তার প্রিয় ছিল। সে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলত প্রাঙ্গণে। গল্প শুনত বড়োদের কাছে।

আমরা অনেকেই জানি না– রাসেলকে নিয়ে একটি টেলিফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এটির কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন বিটিভি'র প্রাক্তন উপ-মহাপরিচালক বাহার উদ্দিন খেলন। এতে রাসেলের কিশোর চরিত্রে অভিনয় করে শিশুশিল্পী আরিয়ান। এ টেলিফিল্মটি প্রযোজনা করেন মাহফুজার রহমান। ফিল্মটি নির্মাণে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং মিজানুর রহমান মিজান রচিত গ্রন্থ থেকে। এটি হৃদয়বিদারক জীবনভিত্তিক ছায়াচিত্র, যা বাঙালি ও বাংলাদেশের শিশুর কান্না ঝরায়। এটি এ প্রজন্মের শিশুদের মাঝে বেশি করে প্রদর্শন করা উচিত। টেলিফিল্মটির নাম *শেখ রাসেল এক ফুলকুঁড়ি*।

বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপনের মাস অক্টোবর। আর এই অক্টোবরের জাতক শেখ রাসেল। শিশু দিবসের মাসে আমরা শিশুদের অধিকারের কথা বলি, তাদের বিকাশের কথা বলি, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাই।

শেখ রাসেল অধিকারহারা এবং নির্যাতিত, নিপীড়িত শিশুদের প্রতীক ও প্রতিনিধি । যখনই অবোধ শিশু-বলি দেখি, তখনই রাসেলের কচি মুখখানা ভেসে ওঠে। মানুষরূপী রক্তখেকো হায়েনাদের হাত কাঁপেনি ১৫ই আগস্টে। বিশ্ব শিশু দিবসের মাস অক্টোবরে রাসেলের জন্ম এবং জন্মক্ষণের শুভদিন। তার জন্মদিন আনন্দের হলেও তাকে হারানোর বেদনার ছবিই আমাদের আবেগে আপ্লুত করে।

নিষ্পাপ রাসেলের আর্তি–'আমাকে মারবে না তো ভাইয়া' বুকের মাঝে শোকের নদী বইয়ে দেয়। রাসেল অধিকারহারা শিশুদের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে। আসুন, বিশ্ব শিশু দিবসে আমরা শিশুহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি ও সোচ্চার হই।

লেখক: সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত– প্রণব মুখার্জি

রেহানা শাহনাজ

বাংলাদেশের দুঃসময়ে পরীক্ষিত বন্ধু ছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ প্রয়াত প্রণব মুখার্জি। প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সূচনা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ থেকে। তিনি একজন বাঙালি। স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জির বাড়ি বাংলাদেশে হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি প্রণব মুখার্জির ছিল গভীর মনের টান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক সিরিজ *ড্রামাটিক ডিকেড: দ্য ইন্দিরা গান্ধী ইয়ারস*–এ তিনি 'মুক্তিযুদ্ধ: দ্য মেকিং অব বাংলাদেশ' নামে একটি পুরো অধ্যায় লিখেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন– 'বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন আমি ৩৬ বছরের এক তরুণ সংসদ সদস্য। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে ভারতের সমর্থন দানের জন্য ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন ভারতের রাজ্যসভায় আমি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ভারতের উচিত বাংলাদেশের প্রবাসী মুজিবনগর সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া। যখন পার্লামেন্টের সদস্যরা আমার কাছে জানতে চান, কীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাধান হবে? উত্তরে আমি জানাই, আমি রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছি। অর্থাৎ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে'। প্রণব মুখার্জি 'বাংলা কংগ্রেসের' প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তিনি তখনো ইন্দিরা গান্ধীর দলে যোগ দেননি। রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁর কখনো দ্বিমত হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতের অবস্থানের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বিভিন্ন দেশে পাঠান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সঙ্গে প্রণব মুখার্জির সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারকে আগলে রেখেছিলেন এই মহান রাজনীতিবিদ। দিল্লিতে যখন শেখ হাসিনা নির্বাসিত ছিলেন প্রণব মুখার্জি তাঁকে (শেখ হাসিনাকে) ভরসা দিয়েছিলেন, নির্ভরতা দিয়েছিলেন। একটি নির্ভরশীল পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয় তখন থেকেই। সেই সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রণব মুখার্জি লিখেছিলেন, শেখ হাসিনা আমার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু।

বাংলাদেশের সঙ্গে প্রণব মুখার্জির ছিল হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক। ২০১৩ সালের মার্চে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ সফরের সময় প্রণব মুখার্জিকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদক দেওয়া হয়। পদক দেবার সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণব মুখার্জিকে 'প্রকৃত বন্ধু' বলে উল্লেখ করেন।

২০১৮ সালে বাংলাদেশে আসেন প্রণব মুখার্জি। সর্বশেষ সফরকালে একজন সাংবাদিক প্রণব মুখার্জিকে যখন প্রশ্ন করেন, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কোন ঘটনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়? তখন তিনি জবাব দেন, 'বাংলাদেশের বিজয়ের মুহূর্তটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত'। এই মহান রাজনীতিবিদ, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ৩১শে আগস্ট চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দিল্লির আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ৯ই আগস্ট দিল্লির রাজাজি মার্গের বাসভবনের বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান প্রণব মুখার্জি। পরদিন ১০ই আগস্ট তাঁকে নয়াদিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ আঘাতের কারণে তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধে। সেদিনই অস্ত্রোপচার করে জমাটবাঁধা রক্ত বের করা হয়। অস্ত্রোপচারের আগেই তাঁর করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে। অস্ত্রোপচারের আগে নিজেই করোনা সংক্রমণ হবার খবর টুইট করে জানান প্রণব মুখার্জি। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ টুইট।

ভেন্টিলেশনে থাকা অবস্থায় ১৩ই আগস্ট থেকে তিনি গভীর কোমায় চলে যান। এরপর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফুসফুসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। অবনতি হয় কিডনির। ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যায় ২১ দিনের জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

সকল মহলের কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। বিভাজন নয়, বরং ঐক্যই ছিল তাঁর রাজনীতির আদর্শ। মানুষের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। ভারতের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল কংগ্রেসে প্রায় পাঁচ দশকের বেশি সময়ের রাজনৈতিক জীবনে তিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রণব মুখার্জিকে কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় সমস্যা সমাধানকারী নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রাজনৈতিক জীবনে এসেছিল নানা উত্থান-পতন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। বৈশ্বিক রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা আর কৌশলের কারণে প্রণব মুখার্জি পরিণত হয়েছিলেন একজন বড়ো মাপের পথপ্রদর্শক-এ। ২০১৯ সালে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' পদকে ভূষিত করা হয় তাঁকে। উপমহাদেশের কিংবদন্তিতুল্য রাজনীতিবিদ প্রণব মুখার্জি, ভারতীয় পার্লামেন্টে যাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মেধা, প্রজ্ঞায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করতে বলেন। যোগদানের পরে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন। অতি অল্প সময়ে ১৯৮২ সালে তাঁকে অর্থমন্ত্রী করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ই জানুয়ারি ২০১৮ বঙ্গভবনে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে স্বাগত জানান। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশের মানুষকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে গেলেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে ফ্রান্সে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সম্মেলনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং পাকিস্তানিদের অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। সেই সময় যুক্তরাজ্য ও জার্মানি সফরে গিয়ে সেখানকার সরকারপ্রধান ও সংসদ সদস্যদের কাছে বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন। নিজের বর্ণাঢ্য জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বই লেখেন ৮টি। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুক্তিযুদ্ধ কোনোটাই বাদ পড়েনি তাঁর লেখনীতে। ভারতের কংগ্রেসের বাইরেও উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রণব মুখার্জি হচ্ছেন একমাত্র ভারতীয় বাঙালি যিনি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

চিত্রাপাড়ের 'জামাই বাবু' হিসেবে খ্যাত ভারতবর্ষের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি বিরল সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ভারতের মতো উদীয়মান শক্তিশালী দেশের দুই দফায় অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পর রাষ্ট্রপতি ভবনের বাসিন্দা হবার পেছনে অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁর স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জি, যিনি ছিলেন বাংলাদেশের নড়াইলের মেয়ে। 'নড়াইলের জামাই বাবু' ভারতের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গেছে। আর সেই আগ্রহের উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নড়াইলের ভদ্রবিলা গ্রামের শুভ্রাকে ঘিরে। প্রায় ৫৮ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষে ২০১৫ সালে শুভ্রা মুখার্জি মৃত্যুবরণ করেন। ২ পুত্র, ২ কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন প্রণব মুখার্জি। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও অব্রাহ্মণ শুভ্রা মুখার্জির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রণব মুখার্জির জন্ম ১৯৩৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের অদূরে মিরাটি গ্রামে। বাবা কামদাকিঙ্কর ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস নেতা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি, এআইটিসিটি সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রাজনীতি প্রণবের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ছাত্রজীবনে প্রণব মুখার্জি রাজনীতিতে জড়াননি। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্বের পরে মন দিয়েছিলেন আইনের ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। তবে আইনজীবী পেশা গ্রহণ করেননি। হাওড়ার বাঁকড়া ইসলামিয়া হাই স্কুলে শিক্ষকতা শেষে ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা আমতলার অদূরে বিদ্যানগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে বিদ্যানগর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের হাত ধরে শুরু হয় রাজনৈতিক সফর। সেই সফরই প্রণবকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরের অন্য এক ঠিকানায়। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা ভোটে হরেন্দ্রনাথ প্রার্থী হন। প্রণব তাঁর প্রচারে পথে নামেন। খুব দ্রুতই বাংলা কংগ্রেসের প্রধান তথা রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির নজরে পড়েন প্রণব। ১৯৫৯ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক সফরে যান প্রণব। পরে তিনি নিজেই রাজ্যসভায় সংসদ সদস্য হন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি অনুগত ছিলেন প্রণব। প্রণবের পুরনো দল বাংলা কংগ্রেস মূল কংগ্রেসের সঙ্গে ১৯৭৩ সালের দিকে একীভূত হয়। ১৯৭৭ সালে লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবি হলে দলের অভ্যন্তরে 'ইন্দিরা হটাও' স্লোগান জোরদার হয়েছিল। দলের ভাঙনে একাধিক নেতা বিরোধী শিবিরে যোগদান করেন। কিন্তু প্রণব স্রোতে গা ভাসাননি। যখন দলনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শোচনীয় অবস্থা ছিল, তখনো দলনেত্রীর প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে প্রণব অটল ছিলেন। ১৯৭৭ সালে লোকসভা ভোটে মালদহে হেরেছিলেন প্রণব। ১৯৮০ সালে লোকসভা ভোটেও প্রণব হেরেছেন। ১৯৮২ সালে ফের উত্থান। মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি রাজ্যসভায় কংগ্রেসের দলনেতার দায়িত্ব পান। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দ্রুত কংগ্রেসের অন্দরে কোণঠাসা হয়ে পড়েন প্রণব। রাজীব গান্ধীর আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের পদ হারান তিনি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হন। 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস' দল গঠন করেও শেষ রক্ষা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয়ভাজন এবং দলের 'নাম্বার টু' হবার ফলে ইন্দিরা গান্ধীর অবর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন প্রণব। যদিও এটা গুজব বলে শেষে প্রমাণ হয়। রাজীব গান্ধী বেশ অনেক পরে বুঝেছিলেন প্রণবের গুরুত্ব। তাঁকে আবার দলে টেনে নেন। রাজনৈতিক জীবনের অনেক উত্থান-পতন শেষে কংগ্রেসে 'নাম্বার টু' আসনটি পুনরায় ফিরে পান প্রণব। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০১২ সালের ২৫শে জুলাই রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ভারত হারাল একজন বিজ্ঞ দেশপ্রেমিক নেতাকে। আর বাংলাদেশ হারাল একজন আপনজনকে। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বেঁচে থাকবেন। আমি সব সময় মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি'।

এই মহান নেতার মৃত্যুতে ভারত সাত দিন ও বাংলাদেশ একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করে।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

পার্বত্য শান্তিচুক্তি: ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে

সানিয়াত রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ২৩ বছরের দ্বারপ্রান্তে। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। সেই হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম আজ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান ছিল। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাকমা রাজার প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে চার দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঐ প্রস্তাবকে অনৈতিক দাবি মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চাকমা প্রতিনিধিদের 'বাঙালিকরণের' প্রস্তাব দেন। চাকমা প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে চাকমা নেতা সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি এবং ১৯৭৩ সালে এক সামরিক শাখা 'শান্তিবাহিনী' গঠন করে। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনী সে সময় তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ সে অঞ্চলে ভয়াবহ ও সংঘাতময় আবহের সৃষ্টি করে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলায় দেশের অনেক সৈনিক শহিদ হন। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পাহাড়ি জনপদ। পাহাড়ে ছিল না শান্তির সুবাতাস। রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল পার্বত্যাঞ্চল। বিশ্বাস ছিল না পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে। শান্তিবাহিনীর সদস্য ছাড়া সাধারণ পাহাড়িরা সেই অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছিল।

সুদীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় এলে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে জাতীয় কমিটি গঠন করে উপজাতীয় প্রধানের সাথে আলোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কেন এই সংঘাত ? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়। রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম চাকমা যুবক সমিতি গঠিত হয়। ১৯১৯ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় চাকমা যুবক সংঘ। ১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ান গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি। প্রায় দু'দশক ধরে এ সংগঠনটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। ১৯৩৯ সালে যামিনী রঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা এ সংগঠনের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন থেকেই জনসমিতির রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। কথিত আছে, ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে জনসমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে পাহাড়ি ছাত্রদের দাবি আদায় সংক্রান্ত একটি সংগঠন 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে অনন্ত বিহারী খীসা ও জে বি লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সমর্থনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ চাকমা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান শাসনামলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পার্বত্য সংঘাতের সূচনালগ্ন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে লক্ষাধিক লোক স্থানচ্যুত হন। এর ফলে হাজারো পরিবার ভারতে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে তীব্র অসন্তোষ আরো ঘনীভূত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। পাহাড়িরা এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিকে নিজেদের রক্ষাকবচ মনে করত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য স্বায়ত্তশাসনের কোনো উল্লেখ নেই। নিজস্ব ভূখণ্ড, পতাকা, ও স্বায়ত্তশাসন বিষয়গুলো একসূত্রে বাঁধা। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতির পরিবর্তে সবাইকে বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এমন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। পাহাড়িরা অবশ্য মনে করে, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে দাবি আদায় সম্ভব নয়, ফলে ১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলার দিঘিনালা থানার বাট্টি নামক স্থানে শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে ছয়টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সদর দপ্তরকে বিশেষ সেক্টররূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি সেক্টর ৪টি জোনে এবং প্রতিটি জোন কয়েকটি সাবজোনে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের পরে মানবেন্দ্র লারমা গোপনে ভারতে চলে যায়। ১৯৭৩ সালে শান্তিবাহিনী গঠিত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছর শান্তিবাহিনী কোনো সামরিক তৎপরতা চালায়নি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরে দুটি মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। একদিকে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বাধীন বামপন্থী লারমা গ্রুপ, অন্যদিকে প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী প্রীতি গ্রুপ। আদর্শগত সংঘাতের কারণে দুটি গ্রুপ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। এরপর ছোটো ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালের এপ্রিলে প্রীতি গ্রুপের ২৩৬ জন সদস্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদিও প্রীতি কুমার চাকমা আত্মসমর্পণ করেনি। ১৯৭৬ সাল থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিবাহিনীর

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী অস্ত্র সমর্পণ

আক্রমণ তীব্র হতে থাকে। সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আন্তরিকতার সঙ্গে দেখেনি। ফলে সংঘাত তীব্র হয় এবং পাহাড়ি জনপদে রক্তের বন্যা বইতে থাকে।

১৯৮৫ সালের ২১শে অক্টোবর জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ছয়টি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অথচ পাহাড়ি অঞ্চলে সংঘাত অব্যাহত রেখেছিল পাহাড়িরা। ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন পাহাড়ি প্রতিনিধিরা। দাবিগুলো হলো:

(১) নিজস্ব আইন পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন এবং জুম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি।

(২) ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন রহিতকরণের লক্ষ্যে ধারা সংযোজন।

(৩) ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত অ-উপজাতীয় বাসিন্দাদের অপসারণ।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র থেকে অর্থ বরাদ্দ।

(৫) বিদ্যমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি করা।

রাজনীতি ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন, এই দাবি পূরণ বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি। এভাবেই চলতে থাকে শান্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাতময় কর্মতৎপরতা। সরকারি তথ্য অনুসারে, ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ১,১৮০ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয় এই সংঘাতে।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার প্রথমবারের মতো পার্বত্য সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করে। একদিকে জনসংহতি সমিতির দাবিদাওয়া ও পাহাড়ি জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি সরকারের ইতিবাচক মূল্যায়ন, অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে রাজনৈতিক সমাধানে জনসংহতি সমিতির আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তিচুক্তি' নামে বিশেষ পরিচিত। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। এই চারটি খণ্ডে সর্বমোট ৭২টি ধারা রয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা প্রদান করা হয়েছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ৫ই মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত ৪ দফায় ১৪৭ জন সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্য শেখ হাসিনা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৯৮ সালের ৫ই মার্চ সর্বশেষ দলের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনীর পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটে। এ চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী ও দুর্ধর্ষ গেরিলাদের একটি বড়ো অংশকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে চুক্তির আগের তুলনায় এখন অনেক উন্নত হয়েছে পাহাড়ি পরিবেশ।

শান্তিচুক্তি নিয়ে দেশি-বিদেশি চক্র রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাহাড়িদের ভুল বোঝাবুঝির আবহ তৈরি করছে এই চক্র। শান্তিচুক্তিতে ছয়টি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার ৪টি ব্রিগেড বাদে বাকিগুলো সরিয়ে নেবার ঘোষণা দিয়েছে। ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস কীভাবে পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করবে– ডিভিশন আকারে, ব্রিগেড আকারে, ব্যাটালিয়ন আকারে, তা সুনির্দিষ্ট করে চুক্তিতে বলা হয়নি। এই অপশনটি রাষ্ট্রের হাতে রয়ে গেছে। তিন পার্বত্য জেলা সদরে রয়েছে ৩টি ব্রিগেড। এর বাইরে গুইমারা ব্রিগেড রয়েছে। গুইমারা ব্রিগেড দীঘিনালায় সরে গেলে রুমা ও আলিকদমে দুটি ব্যাটালিয়ন থাকতে পারে।

পার্বত্য এলাকায় ৪টি ব্রিগেডের মধ্যে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান ব্রিগেডে ৫টি ব্যাটালিয়ন করে সৈন্য রয়েছে বলে জানা যায়। সব মিলে ১৮ ব্যাটালিয়ন সৈন্য রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। একটি ব্যাটালিয়নে যদি ৭০০ করে সৈন্য থাকে তবে ১৮ ব্যাটালিয়নে ১২ থেকে ১৩ হাজার সৈন্য রয়েছে। ৪টি ব্রিগেড নাকি ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনটাই বিবেচ্য। সেনাবাহিনী সরিয়ে আনার জোর দাবি ওঠে প্রায় সময়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে-কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। আমাদের সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি নির্দেশেই দায়িত্ব পালন করছে। মশা, জোক, হিংস্র বন্যপ্রাণী, দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাহাড়ি সম্প্রদায়ের হুমকির মুখে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলেছেন যে, সেনাবাহিনী না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বহু আগেই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ ঢাকার বেইলি রোডে শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

পড়ত। পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার নিয়েছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। তিন পার্বত্য জেলায় ১,৫৩৫ কিমি. রোড নেটওয়ার্কের অর্ধেকই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্মাণ করেছে। আলিকদম, থানচি সড়ক, সাজেক, নীলগিরি সড়কের মতো উঁচু সড়ক নির্মাণ করেছে সেনাবাহিনী। পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী পার্বত্য এলাকায় অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গি তৎপরতা দমন, অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্যরোধ, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে অসামান্য ভূমিকা পালন করছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের শর্ত অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১টি ব্রিগেডসহ ২৩৮টি বিভিন্ন ধরনের সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের সেনাবাহিনীর একাংশ ক্যান্টনমেন্টের আয়েশি জীবন পরিত্যাগ করে পার্বত্য দুর্গম বৈরী পরিবেশে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি হিসেবে সম্প্রতি রাঙামাটিতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও রাঙামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন করা হয়েছে পার্বত্য এলাকায়। শান্তিচুক্তির পর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৪০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও ১০০টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে পার্বত্য এলাকায়। ভারত প্রত্যাগত ১২ হাজার ২২৩টি শরণার্থী পরিবারের ৬৪ হাজার সদস্যকে ইতোমধ্যে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরপর ৫টি ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ পাস করা হয়েছে।

২০১৬ সালে সংসদে ঊষাতন তালুকদারের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বিএনপি- জামায়াত জোট শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছিল। যেদিন চুক্তি স্বাক্ষর হয় সেদিন তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল ডাকা হয়েছিল। বিএনপি'র নেত্রী বলেছিলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষর হলে ফেনী পর্যন্ত দেশ ভারতের দখলে চলে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আমরা পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করেছি। পৃথিবীর অন্যদেশে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরকালে তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করে থাকে। আমরা তা করিনি। এটি আমাদের ভূখণ্ড। এখানকার মানুষগুলো আমাদের। তাদের সমস্যাও আমাদের। সমাধান আমাদেরকেই করতে হবে। শেখ হাসিনার গভীর ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্রনায়োকচিত দূরদর্শিতার কারণে নিকট ভবিষ্যতে এই শান্তিচুক্তির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন হবে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবেই।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ১০০টি বই উৎসর্গ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে বাংলা একাডেমি মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০০টি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতির পিতার ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সারা দেশে অনলাইনভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপর আলোচনাসভা করা হয়। পুতুলনাট্য শিল্পের গৌরবময় অর্জনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক বাংলাদেশের সকল পুতুলনাট্য দল ও শিল্পীদের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অনুদান বৃদ্ধিপূর্বক লাইব্রেরি পরিচালনায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করে তাদেরকে বার্ষিক বিশেষ সম্মানী প্রদানের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে বলে কমিটিকে অবহিত করা হয়।

প্রতিবেদন: মৌমিতা চৌধুরী

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মোংলা বন্দর

ম. জাভেদ ইকবাল

বদলে যাচ্ছে মোংলা বন্দরের চিত্র। দেশে আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে মোংলা বন্দর। শ্রমিকদের মধ্যে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য। এর ঢেউ এসে লেগেছে একসময়ের শিল্পনগরী খুলনাতেও। সড়ক ও রেল যোগাযোগ উন্নত এবং বন্দরের সক্ষমতা বাড়লে আগামী দু'বছরের মধ্যে এ বন্দরের আয় বাড়বে চারগুণ বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

বর্তমানে গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা মোংলা বন্দরকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে এই বন্দরের রাজস্ব আয়ও বাড়ছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, পশুর নদীর নাব্য সংকট নিরসন ও জেটির সংখ্যা বাড়লে আগামীতে এই বন্দর আরও আধুনিক বন্দরে রূপ নেবে।

শুধু একটি বন্দরের ওপর নির্ভর করে একটি দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য চলতে পারে না এ ধারণাকে মাথায় নিয়ে মোংলা বন্দরকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল ও ভুটান এ বন্দর ব্যবহার করবে। ঢাকা এবং খুলনা থেকে পৃথকভাবে বন্দর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হবে। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। কেননা তখন ঢাকা থেকে মোংলা দূরত্ব হবে ২৫০ কিলোমিটার। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার ক্ষমতায় এসেই মোংলা বন্দর আধুনিকায়নের কাজে হাত দিয়েছে। গ্রহণ করেছে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প। আশা করা যায়, এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বন্দরে আবার প্রাণচাঞ্চল্য পুরোদমে ফিরে আসবে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ বন্দরে ৯১২টি দেশি-বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ আসে। হ্যান্ডলিং হয় ১ কোটি ১৩ লাখ টন বাল্ক কার্গো এবং ৫৭ হাজার ৭৩২টি ইউজ কনটেইনার জাতপণ্য। আর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯০৩টি বাণিজ্যিক জাহাজের বিপরীতে হ্যান্ডলিং হয় ১ কোটি ১০ লাখ টন পণ্য। একইসঙ্গে ৫৯ হাজার ৪৫৭টি ইউজ কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি খাতের পণ্য হ্যান্ডলিং করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় হয়েছে ৩২০ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

বন্দর ব্যবহারে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকার সঙ্গে ৭০ কিলোমিটার দূরত্ব কম হওয়ায় এ বন্দরকে এখন বেছে নিচ্ছেন আমদানিকারকরা। ফলে আমদানি-রপ্তানিতে সচল হয়ে উঠছে মোংলা বন্দর। প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে নজর দেন মোংলা বন্দরের উন্নয়নের প্রতি। বন্দরটির গতিশীলতা বাড়াতে এরই মধ্যে ঢাকা-মোংলা চারলেন সড়কের কাজ চলছে। এদিকে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ায় এবং পদ্মা সেতু রেলপথ প্রকল্পে খুলনা-মোংলা রেলপথ যুক্ত হওয়ায় এ বন্দরের বিপুল সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন এর ব্যবহারকারীরা।

বর্তমানে দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির মাত্র ছয় থেকে আট ভাগ সম্পন্ন হচ্ছে এই বন্দর দিয়ে। তবে উন্নত সড়ক ব্যবস্থাপনা, মোংলাকেন্দ্রিক ইপিজেড নির্মাণ ও বন্দরের সক্ষমতা আরও বাড়ানো হলে সেটি ২০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব বলে মনে করেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান।

চেয়ারম্যান বলেন, এক সময় এই বন্দরে বছরে জাহাজ আসত ১০০টি। আর এখন মাসেই আসে ৮০ থেকে ১০০টি জাহাজ। একইভাবে গত ১০ বছরে এই বন্দরে ৩০ ভাগ কার্গো ও ৪০ ভাগ কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে। ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম বাড়াতে হলে সক্ষমতা আরও কয়েকগুণ বাড়াতে হবে। সেই লক্ষ্যে বন্দরের মূল ৫টিসহ মোট ১৩ জেটির পাশাপাশি আরও ৯টি জেটি নির্মাণেরও পরিকল্পনা আছে বলেও চেয়ারম্যান জানান।

এ বন্দরের চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'আমাদের ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ পশুর চ্যানেল আছে। এই চ্যানেলের নাব্য বৃদ্ধি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর পদ্মা সেতু রেলপথ মেগা প্রকল্পে মোংলা-খুলনা রেল সংযুক্ত হচ্ছে, পাশাপাশি পদ্মা সেতু যখন দু'বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ হবে, তখন মোংলা বন্দরের ব্যবহার চারগুণ বেড়ে যাবে'।

এ বন্দরের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা নাব্য সংকট। বর্তমানে পণ্যবাহী বড়ো জাহাজ আনলোড করতে হয় বন্দর চ্যানেলের অদূরে হারবাড়িয়া পয়েন্টে। বন্দর ব্যবহারকারী ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ও এইচ এম দুলাল বলেন, হারবাড়িয়ার ৭, ৮, ৯ ও ১০ বয়ায় ড্রেজিং করা হলে এই বন্দরের গতিশীলতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। আর পশুর চ্যানেলের নাব্য বৃদ্ধি ও চারলেন মহাসড়ক নির্মাণ করে মোংলাকে আধুনিক বন্দর করতে পারলে দেশের ব্যাবসাবাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলেও জানান এই ব্যবসায়ীরা।

নাব্য সংকট নিরসনের বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী মো. শতকত আলী বলেন, 'আমাদের জেটি থেকে হারবাড়িয়া ১০ নম্বর বয়া পর্যন্ত (ইনারবার) ড্রেজিংয়ের জন্য অলরেডি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'প্রকল্পটির দরপত্রও গ্রহণ করা হয়েছে, এখন এর মূল্যায়নের কাজ চলছে। এ প্রকল্পটির কাজ শুরু হলে পশুর চ্যানেলে নাব্য সংকট পুরোপুরি দূর হবে বলে আশা করা যায়'।

২০০৯ সাল থেকে এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মোংলা বন্দর জাতীয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছে। বছরে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয় এ বন্দরের মাধ্যমে। কর্মসংস্থান হয় ১০ হাজার লোকের। তবে পদ্মা ব্রিজ, খুলনা-মোংলা রেললাইন, রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, বিমানবন্দর, ইপিজেড, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, প্রতিবেশী দেশগুলোর ট্রানজিট সুবিধা চালুর পর বন্দরের ব্যবহার আরও ৩ থেকে ৪ গুণ বেড়ে যাবে। দেশি-বিদেশি বাণিজ্য পণ্য আমদানি-রপ্তানির সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মোংলা সমুদ্রবন্দর।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

সচল হয়ে উঠছে অর্থনীতি

সৈয়দ শাহরিয়ার

করোনার ভয়াবহ বিপর্যয় কাটিয়ে আবারো ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের আর্থিক খাত। সচল হয়েছে সব ধরনের অর্থনৈতিক চাকা। রপ্তানি খাত আবারো চাঙা হয়ে উঠছে। বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের কর্মসংস্থানে দেওয়া হচ্ছে ঋণ সুবিধা, বাড়তে শুরু করেছে এলসি খোলার হার। সব খাতেই বাড়ছে কর্মসংস্থান।

বিশ্বব্যাপী চলমান অবস্থার প্রভাব কাটিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া অর্থনীতির খাতগুলো আবারো ধীরে ধীরে সচল হচ্ছে। স্থবির হয়ে পড়া কলকারখানার চাকা ঘুরছে, বাড়ছে উৎপাদনও। বর্তমান সরকারের দেওয়া অর্থনীতি খাতে পুনরুদ্ধারের প্রণোদনামূলক প্যাকেজ ও দ্রুত গৃহীত কৌশলগুলো বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক কাটিয়ে ঢাকাসহ দেশের সবগুলো জেলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার হচ্ছে। জমে উঠছে ব্যাবসাবাণিজ্য। ব্যাংকগুলোতে আমদানি-রপ্তানির জন্য এলসি খোলার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রেমিট্যান্স প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করেছে। কলকারখানায় দেশে ও বিদেশ থেকে নানা অর্ডার আনায় উৎপাদন হচ্ছে পুরো মাত্রায়। দেশীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা গেলে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) আশাবাদ ব্যক্ত করেছে চলতি অর্থবছর (২০২০-২০২১) শেষে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে। এডিবি'র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। কার্যকর উৎপাদন সক্ষমতা এবং রপ্তানি সচল থাকায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো মজবুত হয়ে উঠছে। স্বাস্থ্য ও মহামারি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকার কারণে সরকার গরিব ও দুস্থ মানুষের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করে উপযুক্ত অর্থনৈতিক উদ্দীপনা এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ অর্থনীতির খাতকে সুসংহত করেছে। রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলেই এই পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। বর্তমানে এডিবি বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকেরা যারা দেশে ফিরে এসেছেন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও কর্মসংস্থান ব্যাংক একটি ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের অর্থনীতিতে।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আকাশপথ চালু হয়েছে। চালু হয়েছে সড়কপথ ও জলপথ। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলোও ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে। গতি ফিরছে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। আদালত, পর্যটন কেন্দ্র, ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছুই খুলতে আরম্ভ করেছে। অর্থনীতিকে বাঁচাতে, পর্যটকের সংখ্যা বাড়াতে দেশে দেশে সীমান্তপথ খুলে দেওয়া হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আবারো অর্থনীতির চাকা সচল হচ্ছে দেশে ও বিদেশে।

লেখক: সাংবাদিক, কবি ও প্রাবন্ধিক

রিজার্ভে ৩৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের নতুন রেকর্ড

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে, যা রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১লা সেপ্টেম্বর দিনের শুরুতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন বা তিন হাজার ৯৪০ কোটি ডলারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে (ডলার ৮৪ টাকা ধরে)।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখন বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসছে। এছাড়া আমদানি ব্যয়ের চাপ কম, দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও জাইকার বৈদেশিক ঋণ সহায়তা এবং বিশ্ব সংস্থার অনুদানের কারণে রিজার্ভ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসে ২৭ দিনে ১৭২ কোটি ৫৮ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত বছরের পুরো আগস্ট মাসে ১৪৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। এছাড়া চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২৫৯ কোটি ৯৫ লাখ ডলার সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। একক মাস হিসেবে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ। এর আগে সর্বোচ্চ রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছিল ১৮৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। জানা গেছে, গত অর্থবছর রেমিট্যান্সের ওপর ঘোষিত ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। এরপর থেকেই বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে থাকে। চলতি (২০২০-২০২১) অর্থবছরেও রেমিট্যান্স ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মনিরা হক

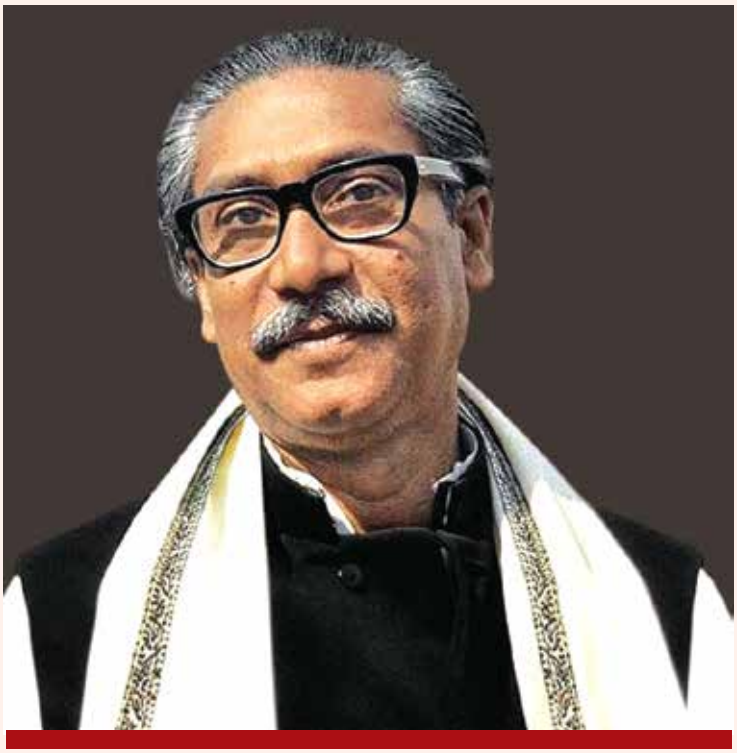

বঙ্গবন্ধুর ব্যাংকিং ভাবনা

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ১৯৪১ সালের ৪ঠা জুলাই গোপালগঞ্জ জেলায় একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপালগঞ্জ এসএম মডেল হাই স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি তৎকালীন হাবিব ব্যাংকে পেশাজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন ব্যাংকিং পেশায় যুক্ত থেকে তিনি সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং পূবালী ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর প্রথম ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিলেন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন তিনি। ২০০৮ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত আর্থিক খাত সংস্কার বিষয়ক টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন। সচিত্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ব্যাংকিং ভাবনা বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এম এ খালেক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি দর্শন ছিল মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সমতা বিধান করা। ব্যাংকিং সেক্টর হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কী ভাবনা ছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বঙ্গবন্ধুর একটি লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করা। তারা যাতে পূর্ণ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত সাধনা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে ব্যাবসাবাণিজ্য এবং শিল্পায়নে পুঁজি জোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেক্টরের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যাংকিং সেক্টরকে ব্যবহার করার জন্য বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পাকিস্তান আমলে একমাত্র ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ছাড়া প্রায় সবগুলো ব্যাংকই ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। অবশ্য ন্যাশনাল ব্যাংকের পুরোটা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল না। এর কিছু অংশ ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং কিছু অংশ ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। তবু ন্যাশনাল ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক বলেই গণ্য করা হতো। অবশিষ্ট সবগুলো ব্যাংকই ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন। পাকিস্তানের বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার ছিল এক একটি ব্যাংকের মালিক। যেমন, হাবিব ব্যাংকের মালিক ছিল হাবিব পরিবার। পাকিস্তানি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এসব ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে টাকা আহরণ করতেন এবং সেই টাকা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হতো। এভাবেই পাকিস্তানি ২২টি পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে জনগণের ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে যে ইশতাহার প্রকাশ করেন সেখানে বলা হয়, আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে পারলে ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করব। অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে ব্যাংকের মালিক এবং ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে কাউকে শোষণ করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু যে কথা বলতেন তা বাস্তবায়ন করতেন। স্বাধীনতার পরপরই তিনি দেশের সবগুলো ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে যেন কেউ বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলতে না পারে। এছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি ব্যাংক মালিকগণ দেশে ফিরে যাওয়ার পর ব্যাংকিং সেক্টরে অরাজকতা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। এসব বিভিন্ন কারণেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরপরই দেশের সবগুলো ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর ক্ষমতাসীন চক্র বঙ্গবন্ধুর নীতিগুলোকে নষ্ট করার চক্রান্ত শুরু করে। ব্যাংকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা হলো। এভাবে ব্যাংকগুলো ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যেতে থাকলে ব্যাংক পরিচালনায় অদক্ষতাকে দায়ী না করে দোষ চাপানো হলো মালিকানার ওপর। বলা হলো, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যাংক লাভজনকভাবে চলতে পারছে না। এক পর্যায়ে সরকার সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক– এই ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে দেওয়া হলো। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংকগুলোকে

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে পূবালী ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো পরবর্তীতে আর কোনো ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হলে তা ব্যক্তি খাতেই দেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় খাতে আর কোনো নতুন ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মালিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংক, আইএফআইসি এ ধরনের অনেকগুলো ব্যাংকের সৃষ্টি হলো। এক পর্যায়ে দেখা গেল, ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ব্যাবসায় ভালো করছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এর কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যায়নি। আর ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে নানাভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। সরকারের ভেতরের লোকজনই ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করত।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

এম এ খালেক: পাকিস্তান আমলে দেশের সবগুলো ব্যাংকের নামই ছিল ইংরেজিতে। স্বাধীনতার পর ব্যাংকগুলোর বাংলা নামকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: এটা একটি অসাধারণ ব্যাপার। আমরা লক্ষ করলে দেখব, বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যেসব কারণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং অন্যটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থ হচ্ছে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের আলাদা কৃষ্টি আছে। আছে গৌরবময় ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সভ্যতা। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ব্যাবসারত ব্যাংকগুলোর বাংলা নামকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শুনেছি– যাঁরা উচ্চ পর্যায়ের ব্যাংকার ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু মূল উদ্যোগটি ছিল বঙ্গবন্ধুর। তিনি চেয়েছিলেন দেশে ব্যাবসারত ব্যাংকগুলোর বাংলা নামকরণ করা হোক। মূলত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই শেষ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর বাংলা নামকরণ করা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের অবদানও ছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর বাংলা নাম সিলেকশন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের নামকরণ করা হয় সোনালী ব্যাংক। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান জুট বা সোনালী আঁশ নিয়ে কাজ করত। তাই এই ব্যাংকের নামকরণ করা হয় সোনালী ব্যাংক। হাবিব ব্যাংকের নামকরণ করা হয় অগ্রণী ব্যাংক। হাবিব ব্যাংক ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাংক। সে কারণেই এর নামকরণ করা হয় অগ্রণী ব্যাংক। ইউনাইটেড ব্যাংকের নামকরণ করা হয় জনতা ব্যাংক। ইউনাইটেড ব্যাংক ম্যাসিভ ব্যাংকিং করত। তাই এর নামকরণ করা হয় জনতা ব্যাংক। রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংকের নামকরণও করেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন বাংলা নামকরণের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। ইংরেজিতে ব্যাংকের নামকরণ করা হতে লাগল। তবে আনন্দের কথা এই যে, এর মধ্যেও কয়েকটি ব্যাংকের নাম বাংলায় করা হয়েছে, যেমন– পদ্মা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক ইত্যাদি। এসব ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে প্রধানত দেশের বিখ্যাত নদীর নামে।

এম এ খালেক: বঙ্গবন্ধু সবসময় কৃষক-শ্রমিকদের জন্য রাজনীতি করতেন। কৃষি ব্যাংকের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বর্তমানে আমরা যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দেখতে পাই এর আগের নাম ছিল এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব পাকিস্তান। কিছু আইনি সংস্কারপূর্বক সেই ব্যাংককে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। এটা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আমলে। বঙ্গবন্ধু জানতেন বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হচ্ছে কৃষি। কাজেই তিনি চেয়েছিলেন দেশের কৃষি খাতকে যেন কোনোভাবেই অবমূল্যায়ন করা না হয়। তিনি মনে করতেন, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা না হলে কৃষকের উন্নতি হবে না। আর কৃষকের উন্নতি না হলে কৃষির উন্নতিও হবে না। মূলত এটা বিবেচনা করেই তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। সেই সময় একমাত্র বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ব্যতীত দেশে কৃষকদের জন্য আর কোনো ব্যাংক ছিল না। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশের কৃষকদের ব্যাংক ঋণের আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এলক্ষ্যে কাজও শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি এর সফল বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথ অনুসরণ করে বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যে কারণে দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

এম এ খালেক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কী ভাবতেন?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হলো। বঙ্গবন্ধু নিজেই বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর এ কে গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে বললেন, এই কাজটি আপনিই করেন। আপনি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করার পর আইন মন্ত্রণালয় তা দেখবে। এটাও বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন আপনি তা লিখে দেন। এ কে গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিতব্যক্তি এবং তিনিই বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের রচয়িতা। বঙ্গবন্ধু এই খসড়ার একটি অক্ষরও আইন মন্ত্রণালয়কে পরিবর্তন করতে দেননি। এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি আদর্শিক স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এম এ খালেক: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যাংকিং সেক্টর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন এক অবস্থায় দায়িত্ব গ্রহণ করার পরও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে খেলাপি ঋণ বা এ ধরনের কোনো সমস্যা ব্যাংকিং সেক্টরে ছিল না। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: সারা পৃথিবীর মধ্যে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। আগের ব্যাংকগুলোকে টেক ওভার করল নতুন ব্যাংকগুলো। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি চমকপ্রদ পদ্ধতি। ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় মূলধনের। তারপর প্রয়োজন হয় প্রমোটার। প্রমোটার হলো সরকার। যেমন সোনালী ব্যাংকের জন্য মূলধন দেওয়া হলো ৫ কোটি টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের মূলধন দেওয়া হলো ৩ কোটি টাকা। এই টাকা সরকার দেয়নি। কারণ সেই সময় সরকারের নিকট দেওয়ার মতো কোনো টাকা ছিল না। ব্যাংকাররাই একটি পদ্ধতি বের করলেন। সোনালী ব্যাংক ৫ কোটি টাকা সরকারকে ঋণ দিল। সরকার সেই টাকা উত্তোলন না করে ব্যাংকেই রেখে দিল। এই টাকা থেকে সোনালী ব্যাংকের প্রতিবছর মুনাফা হতে লাগল। এই লভ্যাংশ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হলো। অর্থাৎ সরকার সরাসরি একটি পয়সাও না দিয়ে ব্যাংকগুলোর জন্য মূলধনের জোগান দিয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও দেখা যায়নি। বঙ্গবন্ধু এবং তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মিলে একটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে মূলধন জোগান দেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু নাই থেকে কিছু সৃষ্টি করা। তাঁরা বেশ সফলও হয়েছিলেন।

এম এ খালেক: বঙ্গবন্ধুর আমলে শহর এলাকায় ব্যাংক ঋণের সুদের হার কিছুটা বেশি এবং গ্রাম এলাকায় সুদের হার কিছুটা কম নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত ?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বঙ্গবন্ধুর আমলে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। সেখানে একটি প্রভিশন এক সময় ছিল। যেহেতু গ্রামে লাভ কম হয় এবং গ্রামের মানুষের আর্থিক সামর্থ্য কম তাই সেখানে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কিছুটা কম নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটা বাধ্যতামূলক ছিল না। কোনো কোনো ব্যাংক এই নীতি অনুসরণ করেছিল। এই উদ্যোগটি ছিল অত্যন্ত ভালো এবং বাস্তবসম্মত একটি পদক্ষেপ। এর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। সে দিনের সেই উদ্যোগটি না থাকলে আজ বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি যতটা চাঙা হয়েছে তা হয়ত হতে পারত না। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা আমরা বর্তমানে লক্ষ করছি, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে।

এম এ খালেক: বর্তমান সরকার শহরের সুযোগসুবিধা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বঙ্গবন্ধু এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি?

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: বর্তমান সরকার শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। আর বঙ্গবন্ধু শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতি বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। শহরের অনেক সুবিধাই এখন গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে। তারপরও বলতে হবে আমাদের দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা এখনো শহরকেন্দ্রিক। সত্যিকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করার আছে। বঙ্গবন্ধু শহরের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি উন্নয়নের কেন্দ্রে গ্রামকেই রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন। জমির আইল তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জমির মালিকানা ঠিক রেখে আইল তুলে দিলে সমবায় ভিত্তিতে সবাই জমি আবাদ করতে পারতেন। এতে ফসল বেশি হতো। গ্রামের যেখানে সেখানে বাড়িঘর তৈরি করার পরিবর্তে একই স্থানে বহুতল বিশিষ্ট ভবন তৈরি করে সেখানে গ্রামীণ মানুষের থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে আমরা শহরে যে রকম অ্যাপার্টমেন্ট ভবন দেখি ঠিক অনেকটা সেই রকম হাউজিং ব্যবস্থা গ্রামে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করায় তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর সেই নীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার আদর্শিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এম এ খালেক: স্যার, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: অর্থনীতি বিষয়ক কলাম-লেখক, গবেষক ও বিডিবিএল-এর মহাব্যবস্থাপক (অব.) এম এ খালেক

মুজিববর্ষে শতঘণ্টা মুজিবচর্চা কর্মসূচির উদ্‌বোধন

'মুজিববর্ষে শতঘণ্টা মুজিবচর্চা' শীর্ষক এক কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। ৩০শে আগস্ট ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করা হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের এত ব্যাপকতা ছিল যে এদেশের মানুষ তাঁর প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেনি। তাই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে নতুন প্রজন্মকে সেই ইতিহাস খুব ভালোভাবে জানতে হবে। জাতির পিতার আদর্শগুলো অনুসরণ করলেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে পারব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আদর্শ বুকে ধারণ করেই এ দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

শতঘণ্টা মুজিবচর্চা প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ বলেন, স্বাধীনতা এ জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধু না থাকলে স্বাধীনতা অর্জিত হতো না। তাঁর কারণেই আমরা আজ একটি সম্মানের জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর জীবনী আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জানানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই কর্মসূচি নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ করে দেবে। মূলত 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবেই মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে মুজিবচর্চার এ সু-উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদন: মো. সুমন শেখ

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা

প্রভাষ চন্দ্র

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপূজা মানেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন বড়ো উৎসব। দেবী দুর্গা আমাদের মাঝে মাতৃরূপে বিরাজ করেন। তাই মা দুর্গা সর্বজনীন। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ, মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হানাহানিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজ গঠন করার শিক্ষা লাভই দুর্গোৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য।

শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা এবং এ পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। পক্ষান্তরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে অভিহিত। বাসন্তী পূজা এখনো প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজা আবহমানকাল থেকে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস) এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে অনেক সময় পঞ্জিকা অনুযায়ী কার্তিক মাসেও শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

হিন্দু পুরাণ মতে, এককালে ভগবান ব্রহ্মা মহিষাসুর নামক এক সাধক পুরুষের ভক্তি ও তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। মহিষাসুর 'অমর' বর প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্ব বর না দিয়ে বর দিলেন– বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো পুরুষের হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে না। এমন বর পেয়ে মহিষাসুর নিজেকে অপ্রতিরোধ্য ভাবতে শুরু করেন। সে ভেবে নিয়েছিল, যেহেতু নারীরা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল এবং কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু নেই, তাই সে হবে অপরাজেয়, অমর। এরপর অসুরকুলের রাজা হন মহিষাসুর।

একটা সময় মহিষাসুর সিদ্ধান্ত নিল স্বর্গ-মর্ত্য জয় করার। তারপর উদ্ধত মহিষাসুর দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিল এবং তার অত্যাচারে স্বর্গের দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে মহিষাসুর অপরাজেয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এরপর সে স্বর্গের দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়ন করতে শুরু করে।

অসুরকুলের অত্যাচারে দিশেহারা দেবতারা ব্রহ্মার দ্বারস্থ হন। তাঁরা ব্রহ্মার দেওয়া কঠিন বরের ভেতরেই সমাধান দেখতে পান। কারণ ব্রহ্মা বর দেওয়ার সময় বলেছিলেন– কোনো পুরুষের হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে না, এখানে নারীর কথা উহ্য রাখা হয়েছিল। এর অর্থ নারীর হাতে মহিষাসুরের পরাস্ত হওয়ায় কোনো বাধা নেই। তখন ক্ষুব্ধ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের আহ্বানে সকল দেবতাদের তেজরাশি একত্র হয়ে দশভুজা এক নারীমূর্তির আবির্ভাব হলো, তিনিই হলেন দেবী দুর্গা। মা দুর্গা। যেহেতু মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরের সঙ্গে লড়তে হবে, দুই হাতে লড়াই করা সম্ভব নয়, তাই দেবী দুর্গাকে দশভুজারূপে কল্পনা করেন দেবতারা। দুর্গা আবির্ভূত হওয়ার পর দুর্গার দশ হাত মরণাস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়। দেবতা শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন তীর-ধনুক, তরবারি, ঢাল, বিষধর সর্প, তীক্ষ্ণ কাঁটাওয়ালা শঙ্খ, বিদ্যুৎবাহী বজ্র শক্তি এবং একটি পদ্মফুল। এরপর দেবী দুর্গা এবং মহিষাসুরের মধ্যে দশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধ শুরু হয়। মহিষাসুরকে পরাস্ত করা রীতিমতো অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ সে মতিভ্রমের মায়ার খেলা জানত, দুর্গাকে

ফটোফিচার: রূপায়ণ সোমেন

বিভ্রান্ত করতে সে একেকবার একেক জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধারণ করছিল। দেবী দুর্গার জন্য যুদ্ধ কঠিন হয়ে ওঠে। এদিকে যুদ্ধে অসুরের ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোটা মাটিতে পড়া মাত্রই সেখান থেকে একই চেহারার আরেকটি অসুর জন্ম নিতে থাকে। এভাবে রক্তাক্ত অসুরের প্রতি রক্তবিন্দু থেকে অসংখ্য অসুরের জন্ম হতে থাকে এবং দুর্গার দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। তখনই দেবী দুর্গা অন্য মূর্তি ধারণ করলেন। সে মূর্তির রূপ হলো আরো ভয়ংকর, চার হস্ত কালী মূর্তি, যাঁর প্রধান কাজই ছিল অসুরের রক্তবীজ মাটি স্পর্শ করার আগেই ধূলিসাৎ করা। এভাবেই রক্তবীজ থেকে অসুরের উৎপত্তি বন্ধ হয়ে গেল। অসুর মহিষের রূপ নিয়ে এসেছিল। শেষমেষ উপায়ান্তর না দেখে মহিষের দেহ থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী মহিষাসুর। তখনই দেবী দুর্গার হাতের ত্রিশূল মহিষাসুরের বক্ষভেদ করল এবং মহিষাসুরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে শান্তি ফিরে এল। স্বর্গের দেবতারা দেবী দুর্গার নামে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। এভাবেই অশুভ শক্তি অসুরকুলের বধের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি ফিরে এল।

অকালবোধন: অকালবোধন কথার অর্থ হলো অসময়ে দেবীর আহ্বান করা। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। কবি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে রাবণ বধের জন্য রাম কর্তৃক আয়োজিত এই শারদীয় দুর্গাপূজার পৌরাণিক কাহিনিটি উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা আছে, রাবণ দেবী দুর্গার আরাধনা করতেন। দেবী দুর্গা তাকে রক্ষা করতেন। তাই ব্রহ্মা রামকে দেবী দুর্গার পূজা করার পরামর্শ দেন। রাবণকে বধ করার জন্য ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গার বোধন, চণ্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন রাম কল্পারম্ভ করেন। তারপর সন্ধ্যায় বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস করেন। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধিপূজার পরেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায়, রাম ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন। হনুমান

তাঁকে ১০৮টি পদ্ম জোগাড় করে দেন। দুর্গা রামকে পরীক্ষা করার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম না পেয়ে রামচন্দ্র পদ্মের বদলে নিজের একটি চোখ উপড়ে দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে দেবী দুর্গা আবির্ভূত হয়ে রামকে কাঙ্ক্ষিত বর দেন এবং রাবণকে ত্যাগ করেন। দুর্গার বরে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে রাবণকে বধ করতে সমর্থ হন।

এ বছর ১৭ই সেপ্টেম্বর মহালয়া পর্ব দিয়ে দুর্গাপূজার সূচনা। মলমাসের কারণে মহালয়ার ৩৫ দিন পর ২২শে অক্টোবর থেকে মহাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার বোধন দিয়ে দুর্গাপূজার মূল পর্ব শুরু। ২৬শে অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার সমাপ্তি হয়। এ বছর দেবী দুর্গার আগমন 'দোলায়', ফলাফল 'মোড়ক' অর্থাৎ অশুভ, মহামারির মতো ঘটনা ঘটবে বিশ্বজুড়ে এবং গমন 'গজে' ফলাফল 'শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা'। এবার মহামারি কোভিড-১৯ ভাইরাসের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সীমিত পরিসরে পূজা পালন। গত ৮ই আগস্ট বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে জানানো হয়, করোনা মহামারির কারণে এবারের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠানমালা, পূজা-অর্চনা শুধু মন্দির প্রাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আলোকসজ্জা, মেলা, আরতি প্রতিযোগিতা ও কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। এবার খোলা জায়গায় অস্থায়ী প্যান্ডেলে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পূজা করার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট আয়োজকদের অনুমতি নিতে হয়েছে।

দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব। শুরু হয় দেবীপক্ষে। শুরুর পর্বের নাম 'মহালয়া'। মহালয়াতে দেবী দুর্গাকে পিতৃলয়ে আবাহন জানানো হয়। মহালয়ার পরে আসে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমী। এ দশদিনের মধ্যে মহালয়া এবং মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী এবং দশমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূজার কদিন সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠে। *'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ/ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'*। দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের কিছু পর্ব আছে যেখানে একেক দিন একেক রীতিনীতিতে দেবীর বন্দনা করা হয়।

মহাষষ্ঠী: ষষ্ঠী পূজার দিনে দেবী দুর্গা চার ছেলেমেয়ে গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিক ও সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে আসেন, এই পৃথিবীতেই তাঁর পিতার বাড়ি। ষষ্ঠী পূজার সন্ধ্যায় মূলত মূর্তির ওপর থেকে ঢাকা পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়। কুমোর তুলির এক টানে দেবী দুর্গার চোখ আঁকেন, যাকে বলা হয় 'দৃষ্টিদান'। এরপর শুরু হয় কল্পারম্ভ, বোধন, আমন্ত্রণ এবং অধিবাস। এসবই পূজার একেকটি অধ্যায়।

মহাসপ্তমী: সপ্তমীর সকালে নয় ধরনের বৃক্ষচারা পূজার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতীকী পূজা করা হয় (প্রকৃতি হচ্ছে দেবী দুর্গার আরেক রূপ), এরপর কল্পারম্ভ, মহাস্নান এবং সপ্তমী পূজা।

মহা-অষ্টমী: অষ্টমী পূজাতে দিনের পূজায় কল্পারম্ভ, মহাস্নান শেষে অষ্টমী পূজা হয়। অষ্টমী পূজার দিনে 'কুমারী পূজা' ও 'সন্ধি পূজা' করা হয়। দেবী পুরাণে কুমারী পূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে। এদিন নির্বাচিত কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। দেবীর মতো সাজিয়ে হাতে দেওয়া হয় ফুল, কপালে সিঁদুরের তিলক এবং পায়ে আলতা। সঠিক সময়ে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। চারদিক শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মায়ের স্তব-স্তুতিতে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শুদ্ধাত্মা কুমারীতে দেবী বেশি প্রকাশ পায়। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতি হয়ে উঠবে পূত-পবিত্র ও মাতৃভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাশীল'।

মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধি পূজা করা হয় (সন্ধি: অষ্টমী তিথির শেষ এবং নবমী তিথির শুরু)। মহিষাসুর বধ যুদ্ধে সন্ধির এ ক্ষণেই দেবী দুর্গা চামুণ্ডা বা কালী মূর্তির রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই এই সময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়ে থাকে। তান্ত্রিক মতে এই পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজায় দেবীকে ষোলোটি উপাচার নিবেদন করা হয়।

মহানবমী: সন্ধি পূজার সমাপ্তি পর্ব থেকেই মহানবমী শুরু হয়, দেবীকে 'অন্নভোগ' সাজিয়ে দেওয়া হয়। ভক্তদের জন্যও ভোজের আয়োজন করা হয়। পাড়ামহল্লায় খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, পায়েস, সন্দেশের মহোৎসব বিরাজ করে।

দশমী ও শুভ বিজয়া: দেবী দুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয়া দশমী। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে এই উৎসব সমাপ্ত হয়। এদিনে বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন ঘটে যেমন– শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ধান-দূর্বা সমর্পণ, একে অপরের মিষ্টিমুখ করানো, দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর পরানো এবং সর্বশেষ উলুধ্বনির মাধ্যমে মা দুর্গার কাছে বিশ্বের সকলের মঙ্গল কামনা করে একে অপরের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে সুদীর্ঘ এয়োতি কামনা করা হয়। এই সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়ে বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান শেষ হয়। সকল ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে বিসর্জনের সময় পূজারীরা মা দুর্গাকে নিয়ে আরতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে করতে আনন্দ মিছিল করে মা দুর্গাকে জলে বিসর্জন দেন। আবার নতুন বছরের জন্য দিন গণনা শুরু হয় মা দুর্গার আগমনের। মা দুর্গা আমাদের মঙ্গল করবে–তা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষ স্থানে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে শান্তিরক্ষায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। বিশ্বের সংঘাতময় দেশগুলোতে বর্তমানে নিয়োজিত ৮১ হাজার ৮২০ জন শান্তিরক্ষী ও স্টাফ অফিসারের মধ্যে বাংলাদেশের ৬ হাজার ৭৩১ জন মিলিটারি ও পুলিশ রয়েছে। ইথিওপিয়া ৬ হাজার ৬৬২ জন শান্তিরক্ষী নিয়ে প্রথম স্থান থেকে নেমে গেছে দ্বিতীয় অবস্থানে। এর আগেও বাংলাদেশ বিশ্বের ১১৯টি দেশের শান্তিরক্ষীর মধ্যে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করেছিল। ইউএন পিসকিপিং মিশনের ওয়েবসাইটে ৩১শে আগস্ট হালনাগাদ করা তথ্যে বাংলাদেশের শীর্ষ অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের মধ্যে মিলিটারি পাঁচ হাজার ৯৫৩ জন (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্য), পুলিশ ৬৪৪ জন, স্টাফ অফিসার ১১৫ জন এবং মিলিটারি এক্সপার্ট ২৯ জন রয়েছে। বিশ্বের ১১৯টি দেশের শান্তিরক্ষীর মধ্যে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও চীন।

প্রতিবেদন: নওশান আহমেদ

নিবন্ধ

বকুল তলায় শরৎ রানি

জাকির আবু জাফর

শরৎ। বাংলাদেশের ঋতুরানি। শরৎ নিজেকে ছড়িয়ে দেয় আকাশে। বর্ষার কালো মেঘগুলো সাদা হয়ে যায়। সাদা মেঘের আনাগোনা গোটা আকাশজুড়ে। আকাশ হয়ে যায় মেঘেদের বাড়ি। কোথাও দল বেঁধে, কোথাও টুকরো টুকরো। মেঘেরা উড়ে। উড়তে উড়তে কাত হয়ে যায়। ঢুকে যায় দল থেকে আরেক দলে। কখনো উধাও হয়ে যায়। হারিয়ে যায় শূন্য থেকে। কোনো কোনো মেঘদল নেমে আসে দিগন্ত থেকে। নেমে আসে পাহাড়ের ডালে। মনে হয় পাহাড়ের চূড়ায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ভেতর নেমে আসে আরও ঘুম। স্বপ্ন দেখে মেঘেরা। দেখতে দেখতে হঠাৎ জাগে। জেগে ওঠে আবার ছোটাছুটি। রাত-দিন।

শরতের সুখ হলো কাশফুল। শরতের হৃদয় হলো কাশফুল। কাশবন মানে শরতের আত্মা। নদী তটে। তীরজুড়ে বাঁকে বাঁকে কাশফুল। নরম বাতাসে দোলে। দুলতে দুলতে বাতাস খায়। শিশুর দোলনার মতো। ডানে। বাঁয়ে। সামনে কেবল দোলা। সাদা সাদা দোলা। হৃদয় কাঁপানো দোলা। চোখ ধাধাঁনো দোলা। কাশের দোলায় দুলে ওঠে মন। দুলে ওঠে মনের গহীনে। সাদা ফুল দুলছে। জমিনে বুবুর দাঁতের মতো সাদা ফুল। মাঝখানে কোমল বাতাস। কাশবনে এসে পড়ে মেঘের কাঁপুনি। মেঘ কাঁপে। কাশফুল কাঁপে। কাঁপে বুক ছোঁয়া মন। কাঁপতে কাঁপতে নদীও কাঁপে। সময় কাঁপে। কাঁপে চোখের নদী। এত মায়াবী। এত নন্দিত দৃশ্য। কেবল শরৎ এনে দেয় বাংলাদেশে।

সুন্দরের ডানা সাজিয়ে উদার হাতে বিলায়। বিলিয়ে দেয় নানান দৃশ্য। কাঁশবন সেই দৃশ্যের কোমল ছবি। কাশবনে উড়ে যায় প্রজাপতি। লাল। নীল। বেগুনি। হলুদ। কালো-ধূসর-রাঙা প্রজাপতি। পাখার কম্পন। ফুলের কম্পন। বাতাস দাঁড়িয়ে যায়। অবাক চোখ দেখে। ফুল ও প্রজাপতির সুখ।

কাশবনে ছুটে আসে মৌমাছি। দারুণ পিপাসা নিয়ে বুকে। তবুও গান করে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে গান। বাতাস ফেরি করে গানের বাণী। মধু বিলিয়ে দিয়ে খুশি করে কাশফুল। ঘাসের বুকে জেগে ওঠে শরৎ সকাল। শিশির মাখা সাদা ঘাস। ঘাস ভরা মাঠ। ঘাসের মাথায় শিশিরের টুপি। নরম রোদ হাসে টুপির গায়ে। ঘাসে ঘাসে শিশির। পাতায় পাতায় শিশিরের টুপি। ফুলে ফুলে শিশিরের ছোপ। শরৎ সকাল কাশফুলের মতো নরম। ঘাসে পা ডুবিয়ে দিলে শিশিরে ভরে যায় পা। ভিজে যায় শিরা-উপশিরা। মনও ভিজে যায়। এক স্নিগ্ধ শীতলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা গায়ে।

শিউলি ফুলের পাপড়িতে কেঁপে ওঠে শরতের ভোর। আদর বুলানো হাওয়া। শিরশির দুলুনিতে মুগ্ধ। কেউ যেন পরশ বুলিয়ে দেয় গায়ে। আরাম। ভীষণ আরাম। ঘুম ঘুম আরামে চোখ বুজে আসে।

শরৎ দাঁড়িয়ে থাকে বকুল তলায়। ঝরে পড়া বকুলেরা দেখে। ডাকে। কাছে আসে শরৎ। বকুলের সৌরভ মেখে নেয়। মেখে দেয় হাতে-মুখে-গায়ে। শরৎ সুবাসিত হয়। বকুল সুবাস। বকুল ছায়ায় নিজেকে ভিজিয়ে নেয় শরৎ দুপুর।

শরতের দুপুর বড়ো নির্মল। নীলের গভীরতা বেড়ে যায় আকাশে। সাদা হালকা মেঘ আনমনে উড়ে যায়। উড়ে দক্ষিণা দিগন্ত ছেড়ে। নীরব পাখা মেলে উড়ে সাদা চিল। যেন তার হারানো চোখ খোঁজে নিরালায়। মেঘের কাছাকাছি ডানা মেলে শিকারি ঈগল। কোথায় লুকিয়ে আছে তার শিকার। শরতের দুপুর খানিকটা দক্ষিণে বেঁকে যায়। ধীরে ধীরে ছোটো হয়। দুপুর হেঁটে যায় বিকেলের দিকে।

ফটোফিচার: নাজিমউদ্দিন

বিকেলের শরৎ আরো মায়াবী। রোদ নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। সবুজ গাছালি রোদ খেয়ে খেয়ে বেশ তাজা হয়ে ওঠে। কলাপাতার গায়ে রোদের সাথে কাত হয়ে থাকে শরৎ। আবার না না করে দুলে উঠে। কখনো কেঁপে কেঁপে ওঠে জারুল ফুলের পাপড়িতে। বর্ষায় ঝরনায় গাছগাছালি যে সবুজ মাখে গায়ে শরৎ সেই সবুজেই হৃষ্টপুষ্ট হয়। বনানীর মতো মাঠও সবুজ হয়ে ওঠে। বর্ষায় রোয়া ধানের শিশু চারারা কিশোর হয়ে যায়। শরতের শেষে পায় যৌবনকাল। মাঠ ভরা ধানের সবুজে গড়াগড়ি করে শরৎ বিকেল।

শরৎ সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায় লালিমার নিচে। লাল-কমলায় রাঙা হয় শরতের মুখ। পাখিদের গানে গানে শরৎ সন্ধ্যা প্রবেশ করে রাতের ঘরে। ঝিরিঝিরি বাতাস হাত বুলিয়ে যায় প্রকৃতির গায়ে। সেই আরাম নিয়ে আসে রাত। পাখিরা চোখ বুঁজে। চোখ বুঁজে প্রকৃতি ও গাছেরা। ধীরে ধীরে শরৎ হাটে রাতের দিকে। রাতের শরৎ মানে ভেজা ভেজা ঘুম। ঘুম ঘুম তারাজ্বলা রাত। রাতভর জেগে থাকা জোনাকি। শরৎ রাতের গায়ে জোনাকিরা খেলে যায়। শরতের বড়ো মজার রাত। না গরম। না ঠাণ্ডা। না খুব দীর্ঘ। না খুব ছোটো।

শরৎ জোছনা শ্রাবণের মতো স্বচ্ছ থাকে না। ধূঁয়ায় মিশিয়ে নামে জোছনারা। কুয়াশা কুয়াশা রাত। কুয়াশায় মাখা মাখা চাঁদ। চাঁদের মুখে বিরাট দাগ। রং মাখা। গোলাকার পাড়। চাঁদকে ঘিরে রেখেছে বুঝি রংধনু। শরতের রাত বেয়ে পাখিরা ভোরের দিকে উড়ে যায়। সেই ভোর নেমে আসে আকাশ ছুঁয়ে। সেই আকাশই হয়ে যায় শরৎ।

শরতে তাল পাকে। বেশ বড়ো বড়ো তাল। তালের সবুজ রং থেকে এই সময় হয়ে যায় কালো লাল। তালের একটা সুগন্ধ আছে। গন্ধটা বেশ তীক্ষ্ণ। কচলে নেওয়া তাল তার গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। এ ঘর ও বাড়ি। খবর হয়ে যায়। সরষে ইলিশের মতো। তালও সুগন্ধ ছড়িয়ে সবাইকে জানান দেয়। বিশেষ করে শরতের শুরুর দিকে তাল পাকে বেশি। তবে সারা শরতেই তাল পাওয়া যায়। এ সময় গাঁয়ের বধূরা তালের পিঠা তৈরি করে। তাল পিঠা খেতে কিন্তু বেশ মজা। শরতের বিকেলেই তাল পিঠার আসর জমে বেশ। মোড়ায় বসে, পিঁড়িতে বসে। চাটাই কিংবা পাটিতে বসে একসঙ্গে তালের পিঠা খাওয়া। আহা! সে আনন্দ কেবল আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশে এবং শরৎ রানির সুন্দর বিকেলে।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক

পিতামাতার সঙ্গে সস্ত্রীক বঙ্গবন্ধু

মধুমতীর খোকা

ইমরুল কায়েস

মায়ের দেওয়া নাম 'খোকা', বাংলাদেশের দেওয়া নাম 'বঙ্গবন্ধু' আর সারা বিশ্বের কাছে সর্বকালের সেরা বাঙালি; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা স্বপ্ন দেখতেন– ছেলে জজ-ব্যারিস্টার হবে, আর মা বলতেন– তাঁর খোকা অনেক বড়ো মানুষ হবে, গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে বিশাল নামডাক থাকবে। মায়ের বচন আর খোকার শৈশব আমাদের তাই বলে, যে সকালের সূর্য দেখে দিনকে চেনা যায়।

সেই সময়ের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের এক ছায়া সুনিবিড় সবুজ শ্যামল গ্রাম 'টুঙ্গিপাড়া'। গ্রামের অদূরেই বয়ে চলেছে মধুমতী নদী। যেমন সুন্দর সেই নদীর নাম, তেমন সুন্দর তার জলের ধারা। যেন দক্ষ কোনো চিত্রশিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা ছবির মতোই সুন্দর গ্রাম। এই গ্রামের কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বাঙালির তথা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। বাড়িটির নাম শেখ বাড়ি। মধুমতীর খালের পাড়ে বিশাল বাড়ি। খালের ঘাটে বাঁধা থাকত শেখ বাড়ির নৌকা। পাড়ে পাড়ে হিজল গাছ। তাল, নারকেল, সুপারি, বকুল, কদম ও সজনে গাছ ঘিরে পুরো বাড়িটি যেন একটি বনের মধ্যে যা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর। খোকার দাদার বাড়িটি গ্রামের আর দশটা বাড়ির মতো নয়। বাড়ির একদিকে আছে এক বিশাল দালান। শুধু এই গ্রামে নয়; তখন আশপাশে আর কোনো গ্রামে এত বিশাল দালান দেখা যায় না।

শেখ বোরহানউদ্দিন ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ। তিনি টুঙ্গিপাড়ার এই শেখ বংশের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর দুই পুরুষ পরে- দুই ভাই শেখ একরামুল্লাহ ও শেখ কুদরতউল্লাহ। শেখ একরামউল্লাহ-এর বংশধর শেখ আবদুল হামিদ। ইনি বঙ্গবন্ধুর পিতামহ। শেখ আবদুল হামিদের ছেলে শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান খোকার বাবা।

সকাল থেকেই শেখ বাড়ির আঙিনাজুড়ে পাড়া প্রতিবেশীসহ আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা। দিনটি ছিল ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। মা সায়েরা খাতুন ও শেখ লুৎফর রহমানের দুই বড়ো মেয়ের পর ছেলে সন্তানের আগমন ঘটেছে। সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে নাতির মুখ দেখে যেন নানার খুশির অন্ত নেই। বাড়ির আশপাশের সবাইকে ডেকে খুশির সংবাদ জানিয়ে বিশাল এক উৎসবের আয়োজন করলেন। আগত লোকজনের মধ্য থেকে একজন সায়েরা খাতুনকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের নাম কি? সায়েরা খাতুন বললেন, ও আমার 'খোকা'। তাঁকে খোকা নামে সবাই ডাকো। তখন থেকে তার সারা পাড়া ও গ্রামজুড়ে এই নাম। সে শুধু এখন টুঙ্গিপাড়ার খোকা নয়; বাংলার খোকা; বাঙালির খোকা।

খোকার বড়ো দুই বোন। দুই বোনের আদরের দুলাল এই দুরন্ত ছোট্ট শিশু। খোকার পরে আসে আরেক বোন হেলেন। খোকা হেলেনকে কী যে আদর করত। সে যখন স্কুলে যেত– হেলেনের জন্য ঝুমঝুমি কিনে আনত। হেলেনকে বলত, তোর জন্যে পুতুল কিনে আনব। বল তুই কি পুতুল নিবি? হাতি-ঘোড়া? যা তোর জন্য সুন্দর দেখে বর-বউ পুতুল নিয়ে আসব। ছোটো বোন হেলেনের পরে খোকার আরেক আদরের ছোটো ভাই আসে। সে হলো নাসের। নাসেরের সাথে খোকার খেলা না করলে চলেই না। পাঁচ ভাই বোনের সাজানো বাগানে খোকাই যেন মধ্যমণি ও বাগানের বড়ো লাল গোলাপ ফুল।

খোকা সারাদিন বাড়ির উঠানে খেলে বেড়াত, পুরো উঠান জুড়েই তাঁর রাজত্ব। তাঁর খালা ও ফুফুদের কোনো ছেলে ছিল না তাই পরিবারের সবারই আদর আর মনোযোগ ছিল খোকার প্রতি। উঠানে মোরগ-মুরগি তাড়া করা, বর্ষার দিনে পায়ে কাদা লাগলে কে খোকার পা ধুয়ে দিবে তা নিয়ে সবার মধ্যে টানাটানি শুরু হয়। খোকার নানার বাড়ি তাঁর বাড়ির পাশেই তাই খোকার সেখানে আলাদা আদর। নানা বাড়ির কেউ মুড়ি ও মুড়কি নিয়ে আসেন, কেউ ফলমূল নিয়ে আসেন। খালের পাড়ে বসে থাকা নৌকা দেখা। জেলেদের নৌকা দেখা, মাছ ধরা, মধুমতীর ঘাটে লঞ্চ দেখা– এসব দেখে খোকার শৈশব কাটে। বোনদের সাহায্য নিয়ে পুকুরে সাঁতার শেখার চেষ্টা।

বাল্যকালে খোকা তাঁর আব্বার কাছে লেখাপড়া শেখে। পরে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছে, 'আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না'। বাড়ির বৈঠকখানায় বসে খুব সকালে মৌলবি সাহেবের কাছে সুর করে আমপারা পড়া। আমপারা পড়তে খোকার বেশ মজাই লাগে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খোকার বাংলা, অঙ্ক আর ইতিহাস পড়া

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

শুরু হয়। নোয়াখালী থেকে আসা সাখাওয়াৎ উল্লাহ মাস্টারের কাছে বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস শেখে।

সাত বছর বয়সে প্রথম গ্রামের গীমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। এর দুই বছর পর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি। পিতার বদলির কারণে মাদারীপুরেও লেখাপড়া করতে হয়। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পরে দেশ ভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়।

ছোটোবেলা থেকেই খোকা অন্যের কথা ভাবত। মা সায়েরা খাতুন ছেলের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করলে সে বলত, 'বারে! খালি আমি খাবো অন্যেরা খাবে না?' মায়ের খোকার মুখে এসব কথা শুনে ভালো লাগত। এতটুকু ছেলে কেবল নিজের কথা নয় অন্যের কথাও ভাবে। একদিকে সবার প্রতি মায়া মমতা, অন্যদিকে দুরন্তপনা ও চঞ্চলতা– এই হচ্ছে খোকার প্রকৃতি। কখনো বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় সে, কখনো অন্যদের সঙ্গে দলবেঁধে মধুমতী নদীতে মাছ ধরতে যায়। খেলাধুলায় খুব আগ্রহী ছিল খোকা। দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, গোল্লাছুট সব খেলাতেই ছিল তাঁর আগ্রহ। খোকা ফুটবল খেলায় খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। গ্রামে, এলাকায়, আশপাশের জেলাগুলোতে তাঁর নামডাক ছিল। ফুটবল দলের ক্যাপটেন হতো। খেলাধুলা ছাড়াও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত খোকা। কখনো দেখা যেত যে, লুঙ্গি কিংবা গামছা দিয়ে মাছ ধরতে পানিতে নেমে পড়েছে। কখনো কৃষকের লাঙল হাতে নিয়ে হালচাষ করার মহড়া দিচ্ছে। এসব কাজে শরীরের চেয়ে মনের জোরই ছিল বেশি।

খোকা পথে এক বৃদ্ধকে শীতে কাঁপতে দেখে তাঁর গায়ের দামি চাদরটি তাকে পরিয়ে দেয়। পরে বাড়ি আসলে বাবা জিজ্ঞেস করে, খোকা তোর চাদর কোথায় রে? চাদর দেওয়ার ঘটনা শুনে বাবা থেমে যান। খোকা বাবাকে বলে গরম কাপড় বলেই তো তাকে দিয়ে দিলাম। নইলে বুড়ো মানুষের শীত মানবে কী করে? আরেকটি ঘটনা–স্কুল ছুটি হলে খোকা তাঁর ছাতা এক বন্ধুকে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি আসলে তাঁর দাদি জিজ্ঞেস করলেন– খোকা? ছাতা কোথায় ফেলে এলি? সে বলে– বন্ধুকে দিয়ে এসেছি। ওর বাড়ি অনেক দূরে। অতটা পথ ভিজে ভিজে বাড়ি যাবে কি করে? তাই ছাতাটা বন্ধুকে দিয়ে এলাম।

গরিব মানুষদের প্রতি ওর গভীর টান, দুস্থদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো, সবকিছু মিলে খোকা সমবয়সিদের মধ্যমণি হয়ে উঠল। মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় খোকার পড়ার জন্য বাবা হামিদ মাস্টারকে বাড়িতে এনে রেখে দিলেন। হামিদ মাস্টারের প্রেরণায় খোকা সমাজের গরিব, দুস্থ মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর নাম দেওয়া হয় 'মুসলিম সেবা সমিতি'। সমিতির সদস্যরা সবাই ছাত্র। তাই তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে অভাবী ও গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করত।

আজকের শিশু যে আগামীর ভবিষ্যৎ– এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক বাংলার খোকার জন্য। শৈশবে যাঁর মহৎ কীর্তি, মানবপ্রেম, নেতৃত্ব ও নেতাসুলভ সমাজসেবা সেই তো তাঁর মায়ের ছোটোবেলায় বলা; আমার ছেলের একদিন অনেক নামডাক হবে; মায়ের স্বপ্ন অধরা থাকেনি। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী জীবনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সর্বোপরি জাতির পিতা হিসেবে ভূষিত হয়েছেন। প্রথম বাংলাদেশের সদ্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য ও অবিস্মরণীয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক: এনবিআর-এর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও এমফিল গবেষক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো 'ম্যুরাল'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড়ো 'ম্যুরাল' বরিশালে নির্মিত হচ্ছে। নগরীর সদর দক্ষিণ রোডের পাশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামের পাশের দেয়ালে এই ম্যুরালটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ম্যুরালটি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন সিটি করপোরেশনের মেয়র সাদিক আবদুল্লাহ। ম্যুরাল নির্মাণ তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সিটি করপোরেশনের ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইয়েদ আহমেদ মান্না জানান, বিদেশি মূল্যবান পাথর দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বুকে জড়ানো কন্যা শেখ হাসিনার আবেগঘন এই ম্যুরাল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে।

প্রতিবেদন: সাঈদ হাসান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই অক্টোবর ২০১৯ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৯' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Cyclone Preparedness Program পুরস্কার প্রদান করেন–পিআইডি

দুর্যোগ প্রশমনে সরকার

সোমা চৌধুরী

দুর্যোগ-এর ইংরেজি শব্দ ডিজাস্টার (Disaster)। এ শব্দটি প্রাচীন ইতালীয় ডায়জেস্ত্রো থেকে মধ্যযুগের ফরাসি ডেজাস্ত্রে থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দুর্যোগ বা Disaster হচ্ছে– প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কোনো ঘটনা, যার ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ-সম্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন অথবা ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবিলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি যা মোকাবিলার জন্য ত্রাণ এবং বাইরের যে-কোনো প্রকারের সহায়তার প্রয়োজন হয়। যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, সুনামি, ভূমিকম্প, খরা, অগ্নিকাণ্ড, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে আগত লাখ লাখ রোহিঙ্গা।

প্রশমন হচ্ছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা পদক্ষেপসমূহ যা কোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাজনিত ফলাফলকে হ্রাস করতে বা কমাতে পারে। দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রশমন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যার কারণে দুর্যোগ, বিপর্যয় বা ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

দুর্যোগ মূলত দুই রকম। যথা: প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে আজ নানারকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা– এসব যেন এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির এসব তাণ্ডব ঠেকানো মানুষের জন্য বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই এসব প্রতিরোধে মূল কাজটি হচ্ছে দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তীতে এমন কার্যক্রম হাতে নেওয়া– যা প্রাণ ও সম্পদহানি হ্রাস করতে পারে। এই সামগ্রিক কার্যক্রমকে বলা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালের ৪৪তম অধিবেশনে ১৯৯০ থেকে ২০০০ দশককে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক ঘোষণা করে। এছাড়া প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বুধবার পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দুর্যোগ নিরাপত্তার জন্য সব পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

বিশ্বের সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এক্ষেত্রে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ঝুঁকির দিক থেকে প্রথম এবং বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে মানবসম্পদ ক্ষতির দিক থেকে ষষ্ঠ। 'ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন'-এর ২০১১ সালের বৈশ্বিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়– বন্যা, সুনামি ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সূচকে বিশ্বের মোট ১৬২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম শুরু করেন। উপকূলীয় জনসাধারণের দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা করে তিনি ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই নতুন আঙ্গিকে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রণয়ন করেন।

বর্তমান সরকার গত দশ বছরে দুর্যোগ প্রশমনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে দাতা সংস্থাগুলো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' শীর্ষক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), ধ্বংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬, দুর্যোগ-পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৫ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাসমূহে ২,০৭৮ কিলোমিটার হেরিং বোন বন্ড করা হয়েছে এবং আরো ১,০৬৮ কিলোমিটার রাস্তার হেরিং বোন করার কাজ চলমান রয়েছে। আইলা ও সিডর আক্রান্ত এলাকায় পানীয় জলের চাহিদা পূরণে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে ৪০টি RWH, ৫০টি DTW, ২২টি Test-Wells এবং ১টি ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে হত দরিদ্রদের বসতবাড়িতে ২,১৫,৬৫৯টি সোলার প্যানেল এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও হাটবাজারে ৩১ হাজার ৫শ ৬২টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোটো ছোটো (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) ৪৬৮টি ব্রিজ, কালভার্ট, সমতল গ্রামীণ রাস্তায় ১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ৫,৬৪৬টি ব্রিজ নির্মাণ করেছে। ভূমিকম্পে উদ্ধার ও

অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩,০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সর্বক্ষণ ভূমিকম্প– পরবর্তী উদ্ধারের জন্য ৩২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়। দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে ত্রাণ গুদাম নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকায় ২৩০টি আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর নতুন ৩৯৩টি ইউনিট গঠন করে ৫,৮৯৫ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫,২৬০ জন। ৩২,০০০ আরবান ভলান্টিয়ার তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নব-জীবন কর্মসূচির আওতায় ৫৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত এবং ৭টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় বিল্ডিং কোডে বর্জ্য নিরোধক দণ্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বজ্রপাতের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারা দেশে ৩১ লক্ষ তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা যেমন– ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ ৯টি জেলা শহরের জন্য মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার পাহাড় ধসের ঝুঁকি মোকাবিলায় মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) সাধারণ ও বিশ্বের কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৪২,৪৬১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,৬১,৭১,১০০ জন উপকারভোগীদের মাসে ২০.৩০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪১৬৬.৩২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে ৩,১৪৫ কিলোমিটার রাস্তায় হেরিং বোন বন্ডকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ২০,৮৪,০০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,৪৭,৩০,৩৫০ জন উপকারভোগীদের মাঝে ২০,৫৩,৪৬৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪৩৫২.৩১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৪২,৯৩,৯৬০ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঢেউটিন বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৫০ কোটি টাকার ৫,১২,৬৫৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ঢেউটিন ক্রয় করে বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬,৬৩,৬৭৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ২২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫টি উপজেলায় পোলফিটেড মেগা ফোন সাইরেন স্থাপন, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স বোট ক্রয় করে ৬টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রাম) বিতরণ, ৪টি সি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট ক্রয় করে কোস্ট গার্ডকে ৩টি ও র‍্যাবকে ১টি বোট প্রদান করা হয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ৫,১১২টি পরিবারকে দুর্যোগ সহনশীল পায়খানা এবং ৪১২টি গভীর নলকূপ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ সরবরাহের জন্য দুর্যোগ বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে ২,০০০টি প্যারাস্যুট তৈরির জন্য সহায়তা প্রদান করেছে। ১৮টি কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের শ্রোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ১২০০টি রেডিও প্রদান করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা' বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। ২০১৮ সালের ১৫ থেকে ১৭ই মে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি '২য় ঢাকা ঘোষণা' হিসেবে গৃহীত হয়।

তাছাড়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দায়িত্ব নিয়েই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করে 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড'। শুধু তাই নয়, ফান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডও। নিজস্ব অর্থায়নে এ ফান্ড গঠনের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচিতি এনে দেয়। বিশ্বের কোনো দেশে নিজস্ব তহবিলে এ ধরনের ফান্ড গঠনের কোনো নজির নেই। এ পর্যন্ত এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া ৩ হাজার কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়েছে ৩৬৮টি প্রকল্প। প্রণয়ন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা। আর এসব কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' প্রদান করা হয় ২০১৫ সালে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের উন্নয়নে চলমান দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাংলাদেশকে অধিকতর সক্ষম করে তুলবে। এলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশে। ২০১৭ সালে মিঠা বা স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ পঞ্চম থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে আসে। আর চাষের মাছ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে থাকলেও বেড়েছে পতিত পুকুরে মাছের চাষ। অর্থাৎ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২০১৯ সালে আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বৈশ্বিক প্রতিবেদন 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২০' অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বে প্রায় ১৮ কোটি টন মাছ অর্ধেকেরও বেশি অভ্যন্তরীণ উৎসের বা মিঠা পানির। বাকি মাছ সামুদ্রিক বা লোনা পানির। সম্প্রতি প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিঠা পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। প্রথম স্থানে রয়েছে চীন। প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বে মাছ চাষের হার বেড়েছে ৫২৭ শতাংশ। পাশাপাশি মাছ খাওয়ার হার বেড়েছে ১২২ শতাংশ।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা কথা দুটি সমার্থক। ইতিহাস যতই পড়েছি, ততই এই প্রত্যয় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মই হয়েছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করবেন বলে। তিনি তাঁর সারাটা জীবন একটা লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছেন, এগিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি– এই লক্ষ্য অর্জন করতে তিনি বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ও তাঁর পরিবার অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট-যাতনা ভোগ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হননি, তিনি আমাদের স্বাধীন করে গেছেন।

শেখ মুজিব যদি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড়ো করে দেখতেন, বেগম মুজিব যদি তাঁর পরিবারের সুখ ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতেন যে-কোনো সাধারণ নারীর মতো, তাহলে এই দেশটা এত সহজে স্বাধীন হতো না।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের নামটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অবদান রয়েছে তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছার। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন– 'আমার জীবনে আমি দেখেছি যে, গুলির সামনে আমি এগিয়ে গেলেও কোনোদিন আমার স্ত্রী বাধা দেয় নাই। এমনও দেখেছি যে, অনেকবার আমার জীবনে ১০/১১ বছর আমি জেল খেটেছি। জীবনে কোনোদিন মুখ কালা কিংবা আমার উপর প্রতিবাদ করে নাই। অনেক সময় আমি দেখেছি যে, যখন জেলে চলে গেছি আমি একআনা পয়সাও দিয়ে যেতে পারি নাই। আমার সংগ্রামে তাঁর দান যথেষ্ট রয়েছে।'

পাকিস্তানের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু অনেকবার জেলে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জি বিবৃতি করা হয়েছে। ১৯৬৬-১৯৬৯ সালে কারাগারে থাকাকালে তিনি তাঁর এই *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* রচনা করেছেন। তাঁর এই অসাধারণ কাজটি করার পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর কাছে তিনি রেণু। উচ্চশিক্ষিত না হয়েও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও যৌবনের কিছু কথা লিখে যাওয়ার তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন এবং সেভাবে স্বামীকে তিনি উৎসাহ জুগিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং লেখার জন্য খাতা কিনে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে লিখতে উৎসাহিত করেছেন।

বেগম মুজিব তাঁর অসাধারণ কাজটি পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে যখন ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার করা হয় তখনো চালু রেখেছেন। নিয়মিত তাঁর স্বামীকে লেখার জন্য খাতা-কলম সরবরাহ করেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অত্যন্ত এক ক্রান্তিকালে কারাগারে বসে তাঁর দিনলিপি লেখার চেষ্টা করেছেন, তা বেগম মুজিব সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের সুখ-দুঃখের ভাগের প্রসঙ্গ নিয়ে বলা যায়– মুজিবের চেয়ে দুঃখ বেশি পোহাতে হয়েছে বেগম মুজিবকে। কারণ, মুজিব সংসার জীবনের দীর্ঘ সময় পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়েছেন। বাইরে থেকে সংসার সামলিয়েছেন বেগম মুজিব। সেইসঙ্গে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সব দায় বহন করতে হয়েছে এই বঙ্গমাতাকে। ধানমন্ডির ঐতিহাসিক যে দোতলা ছিমছাম বাড়িটি ঘিরে বাঙালির সকল লড়াই ও সংগ্রামে আবর্তিত হয়েছিল, সেই বাড়িটির স্বপ্নবীজ বুনেছিলেন বেগম মুজিব। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রায়ই কারাগারে যেতে হতো, পাকিস্তান সরকার সবসময়ে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের শত্রু মনে করত, ফলে কেউ বাড়ি ভাড়াও দিতে চাইত না বেগম মুজিবকে। অনেকবার এমন হয়েছে, চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে বেগম মুজিবকে। তখন ছেলেমেয়েরা ছোটো, তিনি পড়ে যেতেন অকূল পাথারে। কেউ হয়ত ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ছুটে চলার জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ষাটের দশকে বেগম মুজিব ডিআইটি'র কাছ থেকে ধানমন্ডির এই জায়গাটুকু পেয়েছিলেন। কোনো রকমে দুটো ঘর তুলে তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে থিতু হলেন এই বাড়িতে।

স্ত্রী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, রেণু খুব কষ্ট করত কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা-পয়সা জোগাড় করে রাখত, যাতে আমার কষ্ট না হয়।

বঙ্গবন্ধু আজীবন লড়াই করে গেছেন বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত করতে। তাঁর এই লড়াইয়ে তাঁর পরিবারেরও অপরিসীম দান রয়েছে। স্ত্রী বেগম মুজিব এবং ছেলেমেয়েদের এমনকি বৃদ্ধ পিতামাতাকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে, অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে এই লড়াইয়ের জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পিতামাতাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তাঁকে বাবা-মা খোকা বলে ডাকতেন। বঙ্গবন্ধু আইন পড়বেন না শুনে তাঁর আব্বা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন বলেন, 'যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম এখন দেখি তার উলটো হয়ে গেছে। এর একটা পরিবর্তন চাই।... দুর্নীতি বেড়েছে, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্দি করে রাখা হচ্ছে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মুসলীম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পকারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচি, সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় কিছুই নাই।' তাঁর আব্বা তখন বললেন, আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি বিবাহ করেছ, তোমার মেয়ে হয়েছে, তাদের জন্য তো কিছু করা দরকার।

বঙ্গবন্ধু আব্বাকে বললেন, আপনিতো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু করতে না পারি, গ্রামের বাড়ি চলে আসব। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *শেখ মুজিব আমার পিতা* শীর্ষক স্মৃতিচারণে লিখেছেন– একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে আছে বড়ো খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'।

বেগম মুজিব তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হলে ছেলেতো বাবাকে ভুলবেই। বাবার আদর সোহাগ কী জিনিস ছেলেটি বুঝতেই পারল না। বঙ্গবন্ধু যখন জেলে যায় তখন শেখ কামালের মাত্র তিন মাস। বঙ্গবন্ধু তখন ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আমিতো তোমারও আব্বু মানিক, ডাকো আব্বু বলে।

প্রতি দুই সপ্তাহ পর একবার বেগম মুজিব ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন জেলে। সঙ্গে শিশু রাসেলও থাকত। রাসেল একবার বাবার কোলে, আবার তার মায়ের কোলে, একবার টেবিলের ওপর উঠে বসে। বঙ্গবন্ধু রাসেল সম্পর্কে লিখেছেন,

> ৮ই ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে আমাকে বলে, 'আব্বা বাড়ি চলো।' কী উত্তর ওকে আমি দেব। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। ওতো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, 'তোমার মায়ের বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো। একসময় সে তার মাকে বাবা ডাকা শুরু করল।

১৯৬৭ সালের ১৭ই মে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এইদিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> হাসিনা আইএ পরীক্ষা দিতেছে। হাসিনা বলল, 'আব্বা প্রথম বিভাগে বোধহয় পাস করতে পারব না, তবে দ্বিতীয় বিভাগে যাব।' বললাম, দুটো পরীক্ষা বাকি আছে, মন দিয়ে পড়ো। দ্বিতীয় বিভাগ পেলে আমি দুঃখিত হবো না, কারণ লেখাপড়াতো ঠিকমতো করতে পারো নাই।

১৫ই জুন ১৯৬৭ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছে জেলে দেখা করতে। তাঁকে খবর দেওয়া হলো। তিনি আসতেই শিশু রাসেল তাঁকে গলা জড়িয়ে ধরে হাসেন।

> রাসেল জেলকে বলে, আব্বার বাড়ি। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ছোটো মেয়ে রেহানার আবদার সে আমার কাছে থাকবে। আর কেমন করে কোথায় থাকি তা দেখবে। সে বলে, আমি তোমার সাথে থেকে যেতে রাজি আছি।

আমাদের ইতিহাসের দুটো খুব মাহেন্দ্রক্ষণে বেগম মুজিব নীরবে আমাদের ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একটা হলো উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়। শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। এই সময় একটা গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। সারা দেশে প্রচণ্ড আন্দোলন হচ্ছে। আর এই সময়ে শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে বৈঠক করতে! বেগম মুজিব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন বড়ো মেয়ে হাসিনাকে। শেখ হাসিনার হাতে একটি চিরকুট দিলেন। শেখ হাসিনাও সেই চিরকুটের বার্তাটা মুখস্থ করে নিলেন যদি প্রহরীরা চিরকুট কেড়ে নেয়! বেগম মুজিবের বার্তাটা ছিল, 'সারা দেশের মানুষ তোমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত, খবরদার তুমি প্যারোলে মুক্তি নিবা না'। সেই বার্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছেছিলেন। শেখ মুজিব সেদিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্যারোলে মুক্তি নেননি। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণ বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত করে। মাথা উঁচু করে সেদিন তিনি এসেছিলেন। এরপর তিনি হয়ে উঠেন ইতিহাসের মহানায়ক, বাঙালির জাতির পিতা।

এদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাঙালি কখনো কারো অধীনে থাকেনি। বাঙালি আর স্বাধীনতা– এ যেন একে অপরের পরিপূরক। হাজার বছরের বাঙালির এই স্বপ্নপূরণকে সার্থক করে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, ছেষট্টির ৬ দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের হাত ধরে স্বাধীনতার যুদ্ধ– সবকিছুর নেপথ্যে বঙ্গবন্ধুর সুনিপুণ দক্ষতা, দূরদর্শী নেতৃত্ব মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছিল। তারা একাত্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বজ্র বাণীতে। বাংলার মানুষের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার বীজমন্ত্র প্রোথিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর নখদর্পণে। সত্য, ন্যায় থেকে তাঁকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ঐতিহাসিকভাবে আজ একথা স্বীকৃত যে, ছয় দফাই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

যুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাঁর সন্তান শেখ কামাল মুক্তিবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। ১৯৭১ সালে শেখ কামাল পশ্চিমা শাসকদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। হিমালয়ের পাদদেশে মুক্তি ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দিয়ে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন। তারপর গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে শেখ জামালও বিডিআর-এর ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অম্লান থাকবেন। স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর পরিবার। বিশ্বের ইতিহাসে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে বঙ্গবন্ধু উচ্চারিত হবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে। বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে, বাংলা ভাষা পৃথিবীতে যতদিন উচ্চারিত হবে, বঙ্গবন্ধুর নামও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। বাংলা, বাঙালি, স্বাধীনতা–এই তিনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর পরিবার, তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

ছয় দফা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গবন্ধু

কে সি বি তপু

ছয় দফা বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলার জনগণের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোশহীন রাজনৈতিক জীবনে ছয় দফা শুধু তাঁর ব্যক্তি জীবনের জন্য টার্নিং পয়েন্ট নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বঙ্গবন্ধু প্রবল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফাকে জনপ্রিয় করে তুলেন। অপরদিকে ছয় দফার জনপ্রিয়তা বঙ্গবন্ধুকে শীর্ষ নেতৃত্বে উন্নীত করেছে। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে তিনি পূর্ব বাংলার নেতৃত্বের সর্বাধিনায়কে পরিণত হয়েছেন। ছয় দফা শুধু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবক নয়, প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের ইতিহাসকেও। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসনামলে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব সংবলিত ছয় দফা উত্থাপন করেন। ছয় দফাকে বাংলার জনগণের বাঁচার গণদাবিতে রূপান্তরিত করেন বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চূড়ান্ত পর্বে অর্জিত হয় বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতা।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষও অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু বাঙালির মোহভঙ্গ হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কালের মধ্যে। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন পায়নি, বরং পেয়েছে বৈষম্য ও নিপীড়ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে ছয় দফা। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোর শহরেই লাহোর প্রস্তাবের আলোকে স্বায়ত্তশাসন দাবি সংবলিত প্রাণের দাবি ছয় দফা উত্থাপিত হয়। ছয় দফা উত্থাপন করেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত ছয় দফা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি।

তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সোচ্চার হন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতারা তাসখন্দ-উত্তর রাজনীতির গতিধারা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোর পৌঁছান। পরদিন সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসেবে 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ই ফেব্রুয়ারি সম্মেলন বর্জন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায় ছয় দফার বিবরণ ছাপিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরূপে চিত্রিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় 'ছয় দফা'। মূলত ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ব বাংলার তাবেদাররা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তারা শেখ মুজিবকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে থাকেন। তাদের মোদ্দা কথা, শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র করছেন।

লাহোর ছাড়ার আগে বঙ্গবন্ধু ১০ই ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে জোরালো কণ্ঠে বলেন, ছয় দফা আমাদের বাঁচার সনদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরো জোরদার হয়েছে। পাকিস্তানকে স্বনির্ভর করতে হলে সর্বোচ্চ সম্ভব স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। বহিরাক্রমণ ঠেকাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জরুরি। ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরেই তিনি সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ছয় দফার মূল কথাই ছিল– ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকার পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাকি সব নীতি অঙ্গরাষ্ট্রগুলো প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা গ্রহণ করতে পারেননি পশ্চিম এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারাও। ছয় দফা দাবির তীব্র সমালোচনা শুধু যে সরকারি দল করছিল তা নয়, বিরোধী দল থেকেও বিরূপ সমালোচনা হয়। অন্য দল ছাড়াও আওয়ামী লীগের মধ্যেই ছয় দফা নিয়ে মতভেদ

ছিল। দলের অনেক নেতারই ছয় দফায় সমর্থন ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান দমবার পাত্র ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ছয় দফার বাস্তবায়ন ছাড়া বাঙালি জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এই অকুতোভয় বীর দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পেরেছিলেন, 'সরাসরি রাজপথে যদি আমাকে একা চলতে হয়, চলব। কেননা ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।'

লাহোর থেকে ফেরার পর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিতে ছয় দফা দাবি পাস করা হয়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা গৃহীত হয়। পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে ছয় দফা দাবিনামা জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে আওয়ামী লীগ। বাংলার মানুষ ব্যাপকভাবে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানান।

১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুর ওপর নেমে আসে অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন। ছয় দফা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি বুঝতে পেরেছিল, এদেশের মানুষ পর্যায়ক্রমে তাদের আত্ম-অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবেই। তারা বলেছিল, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধান শত্রু আর বাঙালির প্রধান মিত্র। এই একজন নেতা বঙ্গবন্ধু আপোশহীন। বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে তিনি আপোশ করেননি, করছেনও না। পাকিস্তানিরা আরো বলেছিল, ছয় দফার জবাব দেওয়া হবে অস্ত্রের ভাষায়। এ অস্ত্রের ভাষায়ই তারা জবাব দিয়েছিল। কিন্তু জনগণের আন্দোলনের কাছে তারা পরাভূত হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই ছয় দফায় পাকিস্তানি শাসকের ভিত এতটাই কেঁপে গিয়েছিল যে 'আপত্তিকর বক্তব্য' দেওয়ার অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় দফা প্রচারকালে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে থেকে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একটানা ৩৩ মাস কারাবন্দি ছিলেন এ নেতা। বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনে এটাই ছিল দীর্ঘ কারাবাস। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার বীর বাঙালিকে দমাতে পারেননি। ছয় দফা বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। হরতালে নির্বিচারে গুলি চালায় ও লাঠিপেটা করে পুলিশ ও ইপিআর। টঙ্গী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হকসহ ১১ জন বাঙালি শহিদ হন। প্রায় আটশ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী এবং হাজারো নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকেই ৭ই জুন 'ছয় দফা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

পাকিস্তান সরকার নতুন চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেওয়া হয়, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে অধিক পরিচিতি পায়। এই মামলা দেওয়ার ফলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলার মানুষের মনে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনা শাণিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তোলা হয়। ছাত্ররা ছয় দফাসহ এগারো দফা দাবি উত্থাপন করে আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা, মহকুমায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সরকারের পুলিশি নির্যাতন, নিপীড়ন ও দমনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে।

প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। মূলত ১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের সফল হরতালে আতঙ্কিত হয়ে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঊনসত্তরের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান এ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ অন্য বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়া হয়। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়। এভাবেই ছয় দফা দাবি ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে আর বঙ্গবন্ধু অর্জন করে বাংলার একক নেতৃত্ব।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা পরবর্তীতে ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের সত্তরের নির্বাচনি ইশতাহারেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছয় দফার জনপ্রিয়তা আওয়ামী লীগকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী করেছে। ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। এই ছয় দফার পথ বেয়েই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাসে ছয় দফার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার এক দফা দাবিতে রূপান্তরে বাংলার ইতিহাসে ঘটেছে দিক-পরিবর্তন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

বাংলাদেশ ১১৬তম বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে

বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে (জিআইআই) ১৩১টি দেশের মধ্যে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬তম। ৩রা সেপ্টেম্বর এই সূচক প্রকাশ করা হয়। ২০১৯ ও ২০১৮ সালেও বাংলাদেশের একই অবস্থান ছিল।

সূচকের নিরিখে প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত। চার ধাপ উঠে ভারতের স্থান ৪৮তম। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের স্থান শীর্ষে। সূচকের তালিকা প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন, কর্নেল ইউনিভার্সিটি এবং ইনসেড বিজনেস স্কুল। এশিয়ার অর্থনীতিতে চীন, ভারত, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম বছরের পর বছর ধরে উদ্ভাবনী শক্তিতে এগিয়ে থেকেছে। প্রথম ১০-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, আমেরিকা, ব্রিটেন এবং নেদারল্যান্ড। সাধারণভাবে যেসব দেশের আয় বেশি, তারাই এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

প্রতিবেদন: নিলীমা আমিন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ৪ঠা অক্টোবর ২০২০ ঢাকার শিশু হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২০-এর শুভ উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

পোলিও টিকায় রোল মডেল বাংলাদেশ

নাজনীন সুলতানা

পোলিওমাইলিটিজ (Poliomyelitis) এক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। সচরাচর এটি পোলিও নামে পরিচিত। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি এ ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হন। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হন ও তার অঙ্গ অবশ বা পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত এ সংক্রমণ শিশুসহ কিশোরদের বেশি হয়ে থাকে। শতকরা ৯৫ ভাগেরও অধিক পোলিও আক্রান্ত রোগীর শরীরে কোনো উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান উপসর্গ কিংবা স্বল্পমাত্রার উপসর্গ দেখা যায় না। কেবলমাত্র রক্তে প্রবাহিত হয়ে আক্রান্ত হবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তা দৃশ্যমান হয়। এ ভাইরাসটি মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে ও মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকোষকে আক্রান্ত করে। এর ফলে ব্যক্তির শরীর পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থানটি সাধারণত পায়ে হয়ে থাকে। এছাড়াও এর ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মানুষের মস্তিষ্কে ঘটে যা জটিল থেকে জটিলতর হয়। কখনো কখনো এটি মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। পোলিও রোগ ৫ বছরের শিশুদের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

পোলিও রোগের কারণ

পোলিও রোগের প্রধান কারণ হলো পোলিও ভাইরাস। এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির পোলিও রোগ হয়। দূষিত খাদ্য ও পানির সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করার পর এই ভাইরাস রক্তকোষের মধ্যে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে রক্তে সংক্রমণ ঘটায়। পরবর্তীতে ভাইরাস প্রান্তীয় স্নায়ু নিউরনের উদ্দীপনার পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে মাইয়েলিনসমূহকে ধ্বংস করে ফেলে। এই মাইয়েলিনের মাধ্যমেই স্নেহ পদার্থসমূহ স্নায়ুতন্ত্র আবৃত করে, যাতে করে স্নায়ু উদ্দীপনাসমূহ সহজেই সঞ্চালিত হতে পারে। আর এখান থেকেই মাইয়েলাইটিস কথাটি এসেছে। এর ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে পরিণতি পরিলক্ষিত হয় সেটিই হলো শিথিল পক্ষাঘাত বা পোলিও।

পোলিও রোগের লক্ষণ

পোলিও ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে পোলিও রোগের লক্ষণ প্রকাশ প্রায়। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো– শিশুদের সর্দি-কাশির সঙ্গে জ্বর, মাথা ব্যথা, সারা শরীরে ব্যথা, গলা ব্যথা, বমিবমি ভাব, ঘাড় ও পিঠ শক্ত এবং হাত ও পা অবশ হয়ে যায়, মুখের একপাশ অবশ হয়ে যেতে পারে, মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিলে ঢোক গিলতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং হাত ও পা চিকন হয়ে যায়।

পোলিও রোগের চিকিৎসা

ভাইরাসে আক্রান্ত পোলিও রোগটি প্রতিকারযোগ্য নয়, এটি প্রতিরোধযোগ্য। পোলিও রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১. জন্মের পর থেকে প্রত্যেক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে।
২. গোসল করা, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।
৩. স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।
৪. টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
৫. খাওয়ার আগে ও পরে হাত, মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
৬. নোংরা, অপরিষ্কার কাপড় পুকুরে ধোয়া যাবে না।

বাংলাদেশে পোলিও রোগের পূর্বকথা

বাংলাদেশে ১৯৭০ এবং ১৯৮০'র দশকে পোলিও রোগীর সংখ্যা ছিল অনেক। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সাল থেকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি চালু হয়। নব্বইয়ের দশকে পোলিও নির্মূলে সফলতা আসতে থাকে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখের মধ্যে পাঁচ বছরের নিচের বয়সের শিশুদের মধ্যে পোলিও রোগীর সংখ্যা ছিল ৫২ জন। ১৯৮৬ সালের আগে বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে সাড়ে এগারো হাজার শিশু পোলিও রোগে আক্রান্ত হতো। তবে ১৯৮৮ সালে বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল কর্মসূচির আওতায় দেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলে তা দ্রুত কমতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালে এসে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে পোলিওমুক্ত হয়।

বাংলাদেশে পোলিও টিকাদান কর্মসূচি

পোলিওমুক্ত বহুদেশের মতো বাংলাদেশও ১৯৯৫ সাল থেকে শিশুকে মুখে খাওয়ানোর পোলিও টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে পোলিও নির্মূলকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিবছর ১ লক্ষ শিশুকে দুই ফোটা মুখে খাওয়ানো টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির সাফল্যের পাল্লাটা বেশ ভারি, যার জন্য মিলেছে নানান স্বীকৃতি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ কর্মসূচি বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। সব থেকে বড়ো কথা হলো– এ কর্মসূচির ফলেই দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর পাশাপাশি পঙ্গুত্ব রোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি তৃণমূলের স্বাস্থ্যকর্মী-মাঠকর্মীদের আন্তরিকতা আর কমিউনিটির জনগণ, বিশেষ করে মায়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণই সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্য আনা সম্ভব হয়েছে। টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতার জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

২০১০ সালে প্রকাশিত *হেলথ অ্যাট লো কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ারস অন* শীর্ষক বইয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতির যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়, তারমধ্যে ছিল বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচি। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী *ল্যানসেট* ২০১৩ সালে শুধু বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সিরিজ প্রকাশ করে। সেখানে টিকাদান কর্মসূচিতে কমিউনিটি অর্থাৎ তৃণমূলের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমকে সাফল্যের প্রধান নিয়ামক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

Expanded Program on Immunization (EPI)-ইপিআই হলো বিশ্বব্যাপী পরিচালিত কর্মসূচি, যার মূল লক্ষ্য সংক্রামক রোগ থেকে শিশু, মাতৃমৃত্যু ও পঙ্গুত্ব রোধ করা। এ কর্মসূচির উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হচ্ছে ০ থেকে ১৮ মাস বয়সি সব শিশু এবং ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি সন্তান ধারণক্ষম সব নারী। যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, মা ও নবজাতকের ধনুষ্টঙ্কার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কল নিউমোনিয়া, পোলিও মাইলাইটিস, হাম ও রুবেলা–এই ১০ রোগের বিরুদ্ধে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের এ কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহায়তা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। শহর এলাকায় সরকারের কার্যক্রমে স্থানীয় এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে বিনামূল্যে এ টিকাগুলো দেওয়া হয়।

সরকারের হিসাব বলছে, গত বছর ইপিআই কর্মসূচিতে সব টিকাপ্রাপ্তির হার ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ। হাম ও ডিপিটি ছাড়াও বিসিজি তথা যক্ষ্মার যে টিকা দেওয়া হয়, তার হার ১৯৮৫ সালে ছিল মাত্র ২ শতাংশ যা পরবর্তী সময়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৯৯ শতাংশে।

টিকাদান কর্মসূচির কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৯ সালের ৭ই এপ্রিল দেশে ৬টি রোগের বিরুদ্ধে ইপিআই কার্যক্রম শুরু হয় যা বর্তমানে ১০টি রোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে গ্রাম ও শহর এলাকায় ইপিআই সেবা পর্যায়ক্রমে সব উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহজলভ্য করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে পোলিও নির্মূল এবং মা ও শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার দূরীকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ইপিআইতে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে ১৫ মাস বয়সি সব শিশুকে হামের দ্বিতীয় ডোজ টিকা সংযোজন করা হয়। পরে ২০১৫ সালে ১৫ মাস বয়সি সব শিশুকে হাম-রুবেলার দ্বিতীয় ডোজ সংযোজন করা হয়।

একই বছর এক বছরের কম বয়সি শিশুদের নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন এবং ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন সংযোজন করা হয়। জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধে ইপিআই কর্মসূচিতে এইচপিপি ভ্যাকসিন সংযোজনের জন্য ২০১৬ সাল থেকে গাজীপুরে এইচপিপি ডেমোনেস্ট্রেশন প্রোগ্রাম শুরু হয়ে ২০১৭ সালে তা সম্পন্ন হয়। টিকা বীজের গুণগতমান যথাযথভাবে সংরক্ষণে ১৫টি জেলায় ইপিআই স্টোর নির্মাণ করেছে সরকার। চলতি বছর থেকে ১৫-৪৯ বছর বয়সি সন্তান ধারণক্ষম সব নারীকে টিটি টিকার পরিবর্তে টিকা কর্মসূচিতে সংযোজিত করা হয়।

ইপিআই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে মা ও শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার দূরীকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে দেশকে পোলিওমুক্ত করে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে পোলিওমুক্ত সনদ পায়। গত বছর রুবেলা ও কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। এসব সাফল্যের কারণেই ২০০৯ এবং ২০১২ সালে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অবদানের জন্য বাংলাদেশ গ্যাভি অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড পায়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'উত্তরণ'

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম প্রকল্পের উদ্যোগে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'উত্তরণ'-এর উদ্‌বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা।

এ প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে ১১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তথা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; তথ্য মন্ত্রণালয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা কমানোর পাশাপাশি সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল, ঢাকায় ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাফিয়া আলম

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য আইন

সুষমা ফাল্গুনী

১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। ১৯৪৫ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন), যা সংক্ষেপে এফএও। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির তৎকালীন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. প্যাল রোমানি বিশ্বব্যাপী এ দিনটিকে বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠার দিন ১৬ই অক্টোবর দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যই হচ্ছে প্রথম ও প্রধানতম। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিও করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের কৃষি ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও দিক নির্দেশনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন উদাহরণ। ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনে বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগোচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধান তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ১০ গুণ। স্বাধীনতার পর প্রতি হেক্টর জমিতে দেড় টন চাল উৎপাদন হতো। এখন হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে চার টনেরও বেশি। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (এফএও) তথ্যানুযায়ী, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় আর মাছ ও ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে।

আলু উৎপাদনে সপ্তম, আম উৎপাদনে শীর্ষ দশে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ। আর ছাগলের মাংস উৎপাদনে বিশ্বে পঞ্চম। আম উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অবস্থানে। আর আলু উৎপাদনকারী শীর্ষ দশ দেশের কাতারে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে আলু, সবজি আর আম রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রচার করছে। ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ এবং জাটকা নিধন নিষিদ্ধকরণের নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে এখন ইলিশ উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। চিংড়ি রপ্তানি থেকে প্রতিবছর আয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। তাতে বেড়েছে এসব পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের জনপ্রতি প্রাপ্যতা।

কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি, বীজ, সার ও যন্ত্রের ব্যবহার উৎপাদন বাড়ার পেছনে প্রধান উজ্জীবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তার সঙ্গে বিশেষ অবদান রয়েছে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিবিষ্ট গবেষণায় উচ্চফলনশীল, কম সময়ে ঘরে তোলা যায় এমন জাত ও পরিবেশসহিষ্ণু নতুন জাত উদ্ভাবন। বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নীতি, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও যথাযথ বিনিয়োগের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য ভোক্তার অধিকার বলে গণ্য হয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ নিরাপদ খাদ্যকে ভোক্তার অধিকার হিসেবে নেয় এবং এর ব্যত্যয় সেসব দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং একটি সুস্থ আগামী প্রজন্ম তৈরির জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে।

এদেশে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীতে খাদ্যে ভেজাল রোধ সংক্রান্ত সব আইন ও অধ্যাদেশ পর্যালোচনা করে 'দ্য পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯' রহিত করে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' প্রণীত হয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ও আমাদের সংবিধান মতে, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ও সংসদ পিওর ফুড অ্যাক্ট ২০১৩ ও পিওর ফুড বিধিমালা ২০১৪ (the Pure Food Act 2013 (PFA) followed by Pure Food Rule 2014) প্রণয়ন করেছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' কার্যকর করেছে সরকার। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'। বর্তমানে মানুষ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অনেক সচেতন।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয়সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং এলক্ষ্যে একটি দক্ষ কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইন রহিত করে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে মোট ১৩টি অধ্যায়, ৯০টি ধারা এবং একটি তফশিল রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় একাধিক উপধারা সংযুক্ত রয়েছে। এটি ২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন।

নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইনে নিরাপদ খাদ্য বলতে প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী

মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্যকে বুঝানো হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এ যেসব বিধিনিষেধ ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের জন্য আরোপ করা হয়েছে তাহলো– (ক) খাদ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে-কোনো বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার না করা; (খ) খাদ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বা ভারী ধাতু ব্যবহার না করা; (গ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভেজাল খাদ্য বা খাদ্য উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ইত্যাদি না করা; (ঘ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন না করা; (ঙ) খাদ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্যের ব্যবহার না করা; (চ) শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত তেল, বর্জ্য, ভেজাল বা দূষণকারী দ্রব্য ইত্যাদি খাদ্য স্থাপনায় না রাখা; (ছ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য উপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রি না করা; (জ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত কীটনাশক বা বালাইনাশকের ব্যবহার না করা; (ঝ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্য, জৈব খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, স্বত্বাধিকারী খাদ্য উৎপাদন না করা; (ঞ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ ও লেবেলিং না করা; (ট) মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন না করা; (ঠ) রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ বিক্রি না করা; (ড) হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে নির্ধারিত মানদণ্ডের ব্যত্যয়ে পরিবেশন সেবা প্রদান না করা; (ঢ) ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি দিয়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রি না করা; (ণ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নকল খাদ্য উৎপাদন বা বিক্রি না করা; (ত) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রির রসিদ সংরক্ষণ করা; (থ) নিবন্ধন ব্যতিরেকে খাদ্যের আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রি না করা; (দ) খাদ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক খাদ্যসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান; (ধ) খাদ্যদ্রব্য বিপণন বা বিক্রির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনে অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য না দেওয়া; (ন) খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান বিষয়ক যে-কোনো ধরনের মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার থেকে বিরত থাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা হিসেবে আইনে বলা হয়েছে যে, মেয়াদোত্তীর্ণ কোনো মাছ, খাদ্য বা পশুখাদ্য বা খাদ্যপণ্য আমদানি বা মজুদ বা বিতরণ বা বিক্রয় করা যাবে না।

জরিমানা ও শাস্তির বিধান আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন: জীবননাশক বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক বা ভারী ধাতু বা বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কোনো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, আমদানি, প্রস্তুত, মজুদ, বিতরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের অপচেষ্টা করলে অনূর্ধ্ব সাত বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হবে। পুনরায় একই অপরাধ করলে সাত বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ লাখ টাকা জরিমানা হবে।

এছাড়া দূষণ মিশ্রিত কোনো খাবার বিক্রি করলে, ভেজাল খাবার বিক্রয় বা বিক্রয়ের অপচেষ্টা করলে, হোটেল বা রেস্তোরাঁ বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা করলে, শর্ত ভঙ্গ করে কোনো খাদ্যদ্রব্য মজুদ বা প্রস্তুত করলে, অনুমোদিত ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনামে বাজারজাত করা কোনো খাদ্যপণ্য নকল করে বিক্রয়ের চেষ্টা করলে, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা সংরক্ষণের স্থানে শিল্পকারখানার তেল বা খনিজ বা বর্জ্য থাকার অনুমোদন দেওয়াসহ এমন ২০ ধরনের অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব সাত বছর থেকে কমপক্ষে দুই বছর শাস্তি এবং অনধিক ১০ লাখ টাকা অথবা কমপক্ষে তিন লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। একই অপরাধ পুনরায় করলে শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ আরো বাড়ানোর বিধান রাখা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে এবং সারা দেশে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ।

শুধু খাদ্য উৎপাদনেই নয়, নিরাপদ খাদ্যের বিষয়েও মনোযোগী সরকার। নিরাপদ খাদ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্যও সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। আইনের যথার্থ প্রয়োগের পাশাপাশি ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তোলা দরকার। সুস্থ, সবল এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য অপরিহার্য।

লেখক : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক

নোবেল শান্তি পুরস্কার মনোনয়নের তালিকায় বাংলাদেশি মার্কিন চিকিৎসক

২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিশ্বজুড়ে মনোনীত ২১১ জনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডা. রহুল আবিদ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক এবং জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোলিকুলার বায়োলজি ও জৈব রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রিধারী আবিদ ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে ফেলোশিপ শেষ করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আলপার্ট মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক। ডা. রহুল আবিদ ও তাঁর অলাভজনক সংস্থা হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল (হায়েফা)-কে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর অলাভজনক সংস্থা হায়েফা বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বছরে প্রায় ৩০ হাজার পোশাক শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। একইসঙ্গে সংস্থাটি প্রায় ৯ হাজার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও পোশাক শ্রমিকের জরায়ু ক্যানসার স্ক্রিনিং ও চিকিৎসা সেবা ছাড়াও কক্সবাজারে আশ্রিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দেড় হাজারেরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে। এছাড়া সংস্থাটি কক্সবাজারের দুটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জন প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ডা. আবিদ ও তাঁর সংস্থা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ২০১৮ সালে গ্রান্ড চ্যালেঞ্জে কানাডার 'স্টারস ইন হেলথ' পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রতিবেদন: মো. সালাহউদ্দিন

করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য

তারিকুল হাসান

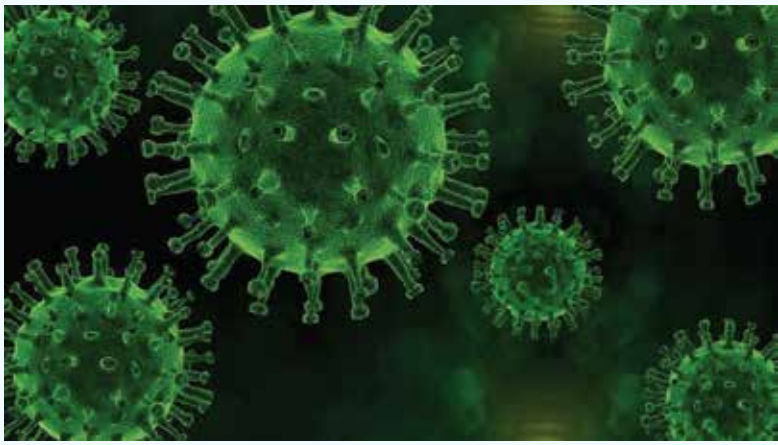

করোনা ভাইরাসের মহামারির ফলে পুরো বিশ্বে তৈরি হয়েছে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। বিভিন্ন দেশে এখনো চলছে লকডাউন, ছুটি বা সবকিছু প্রায় বন্ধ। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা আমাদের সকলের মনের ওপরেই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। দীর্ঘ লকডাউন, করোনার ভয়, চাকরি হারোনো, বেতন কমে যাওয়া, পরিবার বা প্রতিবেশীদের আক্রান্ত হওয়া, সামাজিক দূরত্ব, চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দি রাখাসহ বিবিধ প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। অবসাদগ্রস্ত এবং ভয়ংকরভাবে বেড়ে যাওয়া দুশ্চিন্তার কারণে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা। অজ্ঞানতাই হোক কিংবা অস্বস্তি বোধই হোক, বেশির ভাগ মানুষই এই মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেন না। যার ফলে সমস্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহান প্রদেশে কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক বা ওষুধ না থাকায় এখনো এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপর। এর প্রভাব পড়ছে মানসিক স্বাস্থ্যে কারণ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক সংস্পর্শের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা স্পর্শ শরীরে বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা প্রয়োজনীয় অনুভূতির জন্ম দেয় ও মানসিক চাপমুক্তি ঘটায়। ইতিবাচক স্পর্শে মানুষের শরীরে ডোপামিন, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন নামের হরমোন নিঃসরণ বাড়ায় এবং করটিজল নিঃসরণ কমায়, যার ফলে সৃষ্টি হয় ইতিবাচক অনুভূতি। যেমন– অনুপ্রেরণা, সন্তুষ্টি, নিরাপত্তা, মানসিক চাপমুক্তি ইত্যাদি। দীর্ঘদিন সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার ফলে মানসিক দূরত্বও তৈরি হচ্ছে।

করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক, চিকিৎসা নিয়ে অনিশ্চয়তা, মৃত্যুভয়, আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট, কর্মহীনতা, পরিবর্তিত সামাজিক আচরণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, রোগ নিয়ে নেতিবাচক সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কারের কারণে বাড়ছে মানসিক চাপ। যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যারা হননি এবং যারা সম্মুখ সারিতে থেকে রোগটি প্রতিরোধ আর চিকিৎসায় কাজ করে যাচ্ছেন– তাদের প্রায় সবাই কমবেশি মানসিক চাপে রয়েছেন। কোভিড পরবর্তী বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা আরো প্রকট হবে বলে ধারণা করছেন গবেষকরা।

করোনাকালে মানসিক চাপ আর নানাবিধ মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। ফলে আবেগের পরিবর্তন, ভুলে যাওয়া, মনোযোগের অভাব, ভালো লাগার বিষয়গুলোও ভালো না লাগা, খিটমিটে মেজাজ, রেগে যাওয়া, আগ্রাসী আচরণ করা, ধৈর্য কমে যাওয়া এবং ঘুমের সমস্যা উপসর্গ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। সবার মতো শিশু, কিশোর আর তরুণদেরও মানসিক চাপ বাড়ছে। একদিকে স্কুল-কলেজ বন্ধ, পড়ালেখা, পরীক্ষা হবে কি-না– তা নিয়ে অনিশ্চয়তা, সহপাঠী-বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হচ্ছে না, আর অন্যদিকে বাসায় থাকতে থাকতে একঘেয়েমি, মাঠে গিয়ে খেলা করতে না পারা, অন্য সবার মতো করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়, মৃত্যুভীতি, নতুন জীবনধারা, নিয়মকানুন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ শিশু-কিশোরদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করছে। তার ওপর মা-বাবারা যখন তাদের নিজেদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাগুলো সন্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে শিশু-কিশোর-তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য আরো বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে শিশু-কিশোর-তরুণদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা (অ্যাংজাইটি), তীব্র মানসিক চাপ (স্ট্রেস), ঘুমের সমস্যা (স্লিপ ডিসঅর্ডার), বিষণ্নতা বা অবসাদ (ডিপ্রেশন), পরিবর্তিত পরিস্থিতি মানিয়ে চলার সমস্যা (অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার), আতঙ্ক (প্যানিক ডিসঅর্ডার) ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর যাদের আগে থেকেই কোনো মানসিক বা মাদকের সমস্যা রয়েছে, তাদের লক্ষণগুলো আরো বেড়ে যাচ্ছে। শিশুদের সম্মিলিত বিকাশ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। আবার বয়স্করা সবচেয়ে বিপদাপন্ন এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অনেক বয়স্কদের মধ্যেই এই পরিস্থিতিতে শিশুর মতো অবুঝ আচরণ করতে দেখা যায়। তাই বিশেষজ্ঞরা করোনাকালীন এই পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং নারীদের বিশেষ যত্ন নিতে বলছেন। বেশির ভাগ সংসারে নারীই প্রাথমিক এবং একমাত্র সেবাদানকারী। যে-কোনো সংকটে তার কাজের চাপ এবং মানসিক চাপ উভয়ই বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে অবসাদ, উদ্বেগ বা আতঙ্কের ঘটনা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। প্রায় প্রত্যেকের জীবনে কখনো না কখনো এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাই বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে বলেছেন । অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে নিয়মিত ঘুম ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু মহামারির এই সময়টিতে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন অন্তত আট ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। এটা আমাদের মন ও শরীর উভয়ই ভালো রাখে। মাসনিক চাপ দূর করতে বাগান করা এবং পোষা পশুপাখির আদর-যত্ন করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকগণ। তাদের মতে, নিয়মিত ঘুম, খাবার খাওয়া, শরীর চর্চা, ভার্চুয়ালি সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখা, সুস্থ বিনোদন যেমন– নাচ, গান, সিনেমা দেখা, ছবি আঁকা এমনকি রান্নাও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। নিজেকে ভালো রাখা যায় নানা রকম সৃষ্টিশীল ও ভালো কাজের মাধ্যমে।

দুশ্চিন্তা কাটাতে সবসময় পজিটিভ থিংকিং বা ভালো কিছু চিন্তা করা উচিত। চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম বেশ কার্যকর। নাক দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ার মাধ্যমে ব্যায়াম করা যায়। তবে কোনো কারণ ছাড়াই ৬ মাস বা তার বেশি সময় ধরে এ ধরনের লক্ষণ থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কাউন্সেলিং, রিল্যাক্সেশন থেরাপি এবং ওষুধের মাধ্যমে এর চিকিৎসা সম্ভব। বিষণ্নতা নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক নয় কারণ এটি মারাত্মক আকার ধারণ করলে রোগীকে মৃত্যুচিন্তাও পেয়ে বসতে পারে। শিশু-কিশোর-তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে অভিভাবকদের। নিয়মিত ওরা কেমন আছে জানতে হবে এবং ওদের কথা শুনতে হবে। একটি ইতিবাচক রুটিন তৈরিতে এবং সেটি মানার ব্যাপারে ওদের উৎসাহ দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া, শরীরচর্চা এবং খেলাধুলায় অংশ নিতে উৎসাহিত করতে হবে। শিশু-কিশোর-তরুণদের কথার গুরুত্ব দিতে হবে। ওরা যা বলে– সেটার মূল্য দিতে হবে। কঠিন আবেগতাড়িত বিষয় যেন তারা মোকাবিলা করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী ইতোমধ্যে সচেতনতামূলক পোস্টার, লিফলেট তৈরি করে বিতরণ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিশেষ করে করোনার নমুনা সংগ্রহের সময় তাদেরকে এগুলো দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে অনলাইনে দেশের ৩৮০টি স্বাস্থ্য স্থাপনার ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ১৬২৬৩ নম্বরে তিন শিফটে তিনজন করে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সেবা এখনো চলমান রয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মহামারির প্রভাব ইতোমধ্যে মারাত্মক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে হয়ত কোভিড মহামারি মোকাবিলা করা যাবে, কিন্তু এর প্রভাবে যে 'সেকেন্ড ওয়েভ' আসবে, সেটা হবে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মহামারি। বহু মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হবেন। বহু মানুষ পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগবেন। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তি, কোভিড সংক্রমিত নন কিন্তু লকডাউনের কারণে বাসায় আছেন এমন ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে স্ট্রেস (মানসিক চাপ), উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা, আতঙ্কের (প্যানিক অ্যাটাক) হার সাধারণ সময়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ আর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ছোটো আকারের কিছু গবেষণা হয়েছে। *জার্নাল অব অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার* আগস্ট ২০২০-এ বাংলাদেশের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর এ বছরের এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া ৫০৫ জন শিক্ষার্থীর ওপর অনলাইনে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায়, ৩৩ শতাংশের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপজনিত উপসর্গ রয়েছে, যা সাধারণ সময়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। তাই করোনাকালীন এই সময়ে প্রত্যেকের নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর রাখতে হবে। সকলের সহযোগিতায় সম্ভব এই সমস্যার সমাধান।

লেখক: প্রাবন্ধিক

'আসল চিনি' নামে ক্যাম্পেইন চালু

অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার রোধে মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে 'আসল চিনি' নামে একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে সরকার। ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিসিসি মিলনায়তন ও জুম অনলাইনে এ ক্যাম্পেইনের উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি (ডিএসএ) এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এলআইসিটি প্রকল্প যৌথভাবে তিন মাসব্যাপী এ ক্যাম্পেইনে দেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষকে সচেতন করবে। এ ক্যাম্পেইন উপলক্ষে 'দুর্বার' (www.durbar21.org) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিবন্ধনের মাধ্যমে সারা দেশে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার আওতাধীন ওয়ার্ড, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে দুজন করে অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেওয়া হবে। তারা গুজবের ভয়াবহতা এবং কীভাবে সত্য-মিথ্যা ও গুজব চেনা যায় সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে। যারা এই প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট পড়তে চান তারাও দুর্বার-এ নিবন্ধন করে পড়তে পারবেন। অনুষ্ঠানে গুজবের শিকার হয়ে ২০১৯ সালে নিহত তসলিমা বেগম রেনুর দুই মেয়ে তুবা ও মাহিরকে দুটি ল্যাপটপ উপহার দেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: আবিদ হোসেন

প্রবীণ দিবস ও বাংলাদেশের প্রবীণ

রবিউল ইসলাম

'কাউকে ফেলে রেখে নয় বরং সকলকে নিয়ে বিশ্বসমাজের প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির অভিযাত্রা চলমান রাখতে হবে'– জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মহাত্মই এখানে। শৈশব, কৈশোরে, যৌবন, বার্ধক্য– জীবনের চারটি স্তর। বয়সের বিবেচনায় আমাদের সমাজ বরাবরই তরুণ-যুব-কর্মক্ষমের অনুকূলেই থাকে। চারপাশে শুধুই তরুণ-যুবসমাজের জয়জয়কার। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের যে পথপরিক্রমা, তা চলতে থাকে অবিরাম। মানব বা প্রাণী সৃষ্টির পর থেকে শুরু আর শেষের খেলা নিরন্তর চলছে। প্রজন্ম থেকে আসা-যাওয়ার এই বিভাজনে প্রবীণ একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। তাই প্রবীণদের সুরক্ষার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রবীণদের (৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি) এ বিষয়টি যেন সবাই এড়িয়ে যেতে চান। এটি কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশেই হয়ে আসছে। প্রবীণদের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ প্রতিবছর ১লা অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯১ সাল থেকে এ দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে।

বিগত ৫০ বছরে বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়ে যাওয়া, বিভিন্ন ধরনের মরণব্যাধির যথাযথ প্রতিষেধক আবিষ্কার, প্রতিরোধ ও প্রতিকার পাওয়ার ফলে একদিকে যেমন মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে, তেমনি বিশ্ব সমাজে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৯০ সালে বিশ্বজুড়ে প্রবীণ সংখ্যা ছিল ৫০ কোটি, যা ২০১৫ সালে দাঁড়ায় ৯০ কোটিতে। ২০৩০ সাল নাগাদ হবে ১৪০ কোটি এবং ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ২০৯ কোটি। বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাস করছেন প্রায় ১.৪০ কোটি প্রবীণ। ২০২৫, ২০৫০ এবং ২০৬১ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে দুই কোটি, সাড়ে চার কোটি এবং পাঁচ কোটি। ২০৫০ সালে এদেশের শিশু এবং প্রবীণদের অনুপাত হবে মোট জনসংখ্যার ১৯ঃ২১ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর।

বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে নিকট অতীতে একজন প্রবীণ কোনো না কোনো সন্তানের কাছে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারতেন। মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক অনুশাসন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে পরিবারে প্রবীণদের প্রতি অবেহলা ছিল না বললেই চলে। বরং তখন তাদের বটবৃক্ষের ছায়া মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার কল্যাণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ১/২-এ নেমে এসেছে। চাকরি, ব্যাবসা বা পড়াশোনার জন্য সবারই পরিবার এখন আলাদা বসবাস করছে। যার ফলে পরিবারের প্রবীণরা ভুগছেন একাকিত্বে, হয়ে পড়ছেন অসহায়। আবার অনেক সন্তানই বিশেষ করে পুত্রসন্তানরা তাদের বৃদ্ধ মা-বাবাকে গ্রামে অথবা Old Home বা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে নিজেরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিধান রেখে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রবীণবান্ধব। দেশের বিরাট আকারের প্রবীণদের বাস্তবকল্যাণ বিধানে শেখ হাসিনার বিচক্ষণ উদ্যোগ, সাফল্য এবং কর্মপরিকল্পনা প্রশংসিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে যুগান্তকারী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রচলন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ প্রণয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯/৬০ করা, পেনশন সুবিধা সম্প্রসারণ, পিতামাতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবারের সদস্য ৪ জন থেকে ৬ জনে উন্নীতকরণ, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে অনুদান বৃদ্ধি করাসহ প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ প্রবীণদের সুরক্ষায় সরকারের দায়বদ্ধতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকার দেশের প্রবীণ নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বয়স্ক ভাতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার প্রায় ১ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময় সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করার বিষয়টি লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রবীণদের সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে তাদেরকে 'Senior Citizen' বা জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলো হলো– ১. প্রবীণ ব্যক্তি বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ২. জেলা প্রবীণ কল্যাণ কমিটি, ৩. থানা/উপজেলা প্রবীণ কল্যাণ কমিটি এবং ৪. পৌর, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন প্রবীণ কল্যাণ কমিটি। নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

আজকের একক পরিবারে প্রবীণদের একাকিত্ব দূর করতে আমাদের সকলের উচিত তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং তাদের সমস্যা বুঝে তাদের পাশে দাঁড়ানো। মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর বিচক্ষণতা দিয়ে প্রবীণরাই পারবেন সমাজের সকলের জন্য সমান উপযোগী বাংলাদেশ গড়ার পরামর্শ দিতে। কারণ 'প্রবীণের যুক্তি আর নবীনের শক্তি– এই দুয়ে মেলে সমাজের মুক্তি'।

লেখক: প্রাবন্ধিক

কন্যাশিশুর সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ

মো. আলী নূর

আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই প্রতিটি কন্যাশিশুর অধিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। কন্যাশিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা প্রদর্শন করছে যা বহির্বিশ্বেও প্রশংসিত হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিধান সন্নিবেশ করেন এবং শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন 'শিশু আইন ১৯৭৪'। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে-কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ শিশু যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের জনগোষ্ঠীকে শিশু হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, অসচেতনতা ও কুসংস্কারের কারণে আমাদের কন্যাশিশুরা অনেক সময় নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। অথচ ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব শিশুর মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার।

বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। কন্যাশিশুদের অগ্রগতির অন্যতম বাধা বাল্যবিবাহ। বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন রহিত করে অধিকতর কঠোর ধারা-উপধারা সন্নিবেশ করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাস করেছে। পাশাপাশি কন্যাশিশুদের কল্যাণে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলথলাইন স্থাপন, কিশোরী ও নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। কিশোরীদের সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে কন্যাশিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে দেশব্যাপী 'কিশোরী ক্লাব' গঠন করা হয়েছে। কন্যাশিশুদের শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এটি। শিশুদের সার্বিক বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের ৪ হাজার ৫শ ৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৩৩০টি পৌরসভায় সর্বমোট ৪ হাজার ৮শ ৮৩ জন কিশোর-কিশোরী নিয়ে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব ক্লাবে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি ১০ জন কিশোর ও ২০ জন কিশোরী শিশু অধিকার, সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা লাভ করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে শিশু অধিকার সুরক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের জন্য বই, বৃত্তি ও স্কুলের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এইসব শিশুদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার সহায়তা প্রদানের জন্য এক হাজার কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম

ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮৫ শতাংশই বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। মাত্র চার বছর আগেও এই উৎপাদনের হার ছিল ৬৫ শতাংশ। মৎস্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডফিশের চলতি মাসের হিসাব থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম গণমাধ্যমকে বলেন, মা ও জাটকা ইলিশ ধরা বন্ধ করায় আমাদের এই সাফল্য এসেছে। ইলিশের বড়ো হওয়ার জন্য অভয়াশ্রমগুলো বাড়ানো এবং সুরক্ষা দেওয়াও ভূমিকা রেখেছে। ইলিশ ধরার জালের আকৃতি নতুনভাবে নির্ধারণ করায় ভবিষ্যতে আরো বাড়বে ইলিশের উৎপাদন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মা ইলিশ রক্ষা অভিযানের অংশ হিসেবে প্রতিবছর ৭-২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এ কর্মসূচিও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বড়ো ভূমিকা রাখছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ওয়ার্ল্ডফিশ ২০১৮-২০১৯ সালে বাংলাদেশ যৌথভাবে ইলিশের জিনগত বৈশিষ্ট্য ও গতিবিধি নিয়ে প্রথম একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে।

প্রতিবেদন: জাহানারা বিনতে এনায়েত

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য

সাবিহা সুলতানা

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে চোখ তথা দৃষ্টি সর্বাধিক তাৎপর্য বহন করে আমাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে। চোখ দিয়েই মানুষ স্রষ্টার সৃষ্ট এই ধরণীর সৌন্দর্য সুধা উপভোগ করে, অবলোকন করে তার পরিবার সমাজ তথা সামগ্রিক মানবজাতির চলমান প্রক্রিয়াকে।

দুর্ভাগ্যবশত মানুষের মধ্যেই অনেকে জন্মগতভাবে অথবা জন্মের পর সময়ের কালস্রোতে বিবিধ দুর্ঘটনাবশত তাদের এই দৃষ্টি তথা অবলোকন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাদের দেখতে না পাবার এই প্রতিবন্ধকতাকেই 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ অনুযায়ী নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে কোনো ব্যক্তি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবেন। যথা:

১. সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (Blindness)

   i. উভয় চোখে একেবারেই দেখতে না পারা বা

   ii. যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পর দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (Visual Acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা

   iii. দৃষ্টি ক্ষেত্র (Visual Field) ২০ ডিগ্রি বা এর চাইতে কম;

২. আংশিক দৃষ্টিহীনতা (Partial Blindness), যথা– এক চোখে একেবারেই দেখতে না পারা;

৩. ক্ষীণদৃষ্টি (Low Vision):

   i. উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখতে পারা: বা

   ii. যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (Visual Acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে বা

   iii. দৃষ্টি ক্ষেত্র (Visual Field) ২০ ডিগ্রি থেকে ৪০ ডিগ্রির মধ্যে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি না থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ অধিকার নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এবং তার জীবন ও মানের পূর্ণ বিকাশ করার সুযোগ তিনি পাবেন। সবক্ষেত্রে সমান আইনি স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা পাওয়া অধিকার রাখেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। মাতা-পিতা, বৈধ না আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সঙ্গে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন, উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও প্রবেশগম্যতা ইত্যাদি সকল কিছুই তাদের প্রাপ্য। কিন্তু নিজেদের প্রতিবন্ধিতার কারণে তারা জীবন চলার স্রোতে কোথায় যেন ছিটকে পড়ে। তাদেরও রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে তাদের বিস্তার বিচরণের সুযোগ রয়েছে। কারণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রথমে দেশের নাগরিক পরে সে প্রতিবন্ধী। যদিও অজ্ঞতা, ভয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কারণে এরা অবহেলিত ও বঞ্চিত হয় তাদের মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলো থেকে। এদেরকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার তার মানবিক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সবসময়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ চোখের রোগে ভুগছে, যাদের মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ দৃষ্টিহীনতা এবং বাকি ২৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষ দৃষ্টি বা চোখের অন্য কোনো রোগে ভুগছে। চোখের রোগীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। এদের প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্য প্রতিবছর অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ২০২০ সালের মধ্যে নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বকে নির্মূল করার স্লোগান নিয়ে বিশ্বব্যাপী চোখের যত্ন নেওয়ার জন্য গণসচেতনতা তৈরি, চক্ষু রোগে নির্মূলে প্রভাবিত করা, চোখের যত্ন নেওয়ার তথ্য জনগণের কাছাকাছি আনাই হলো এই দিবস পালনের লক্ষ্য। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ১৯৭৪ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলক ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা করতে পারে এবং নিজস্ব পরিবেশ এবং অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮টি আবাসিক এবং ৩৬টি অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব সেবা প্রদান করা হয় তাহলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকরণ; বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়াসহ হোস্টেল সুবিধা প্রদান এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসন। এছাড়া প্রতিটি কার্যক্রমে একজন করে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'রিসোর্স শিক্ষক'-এর তত্ত্বাবধানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্তমান সরকারের আমলে সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে দেশে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ পাস করা হয়েছে। যেই আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সরকার নিরসল কাজ করে যাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো ৯ হাজার ৭০৩ কপি ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

স্তন ক্যানসার: সচেতন হই জীবন বাঁচাই

কেকা আহমেদ

শরীরের কোনো স্থানে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি হলে সেটাকে সাধারণত টিউমার বলে। স্তনে হতে পারে দুই ধরনের টিউমার যথা– বিনাইন টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইনের অবস্থান তার উৎপত্তি স্থলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আগ্রাসী ধরনের যা রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে দূরের বা কাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে। আর স্তনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হচ্ছে ক্যানসার যা সাধারণত দুধবাহী নালিতে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য টিস্যু থেকেও শুরু হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি পিণ্ড বা চাকা হিসেবে প্রথমে দেখা দেয় এবং আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। স্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণে বাহুমূলেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ই অক্টোবর 'স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালন করা হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করা হয়। এই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই– বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ১৫ লাখের বেশি নারী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন আর প্রতি লাখে ১৫ জন নারী মারা যান। সাধারণত ৫০ বছরের বেশি বয়সি নারীদের মধ্যে এই ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, এতদিন এই ক্যানসারের ব্যাপারে নারীদের সচেতন করার জোরটা ছিল বেশি কিন্তু এখন পুরুষদেরকেও সচেতন করার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কারণ পুরুষদের মধ্যেও স্তন ক্যানসার দেখা দিতে পারে। যদিও পুরুষদের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার খুবই কম। যুক্তরাজ্যে প্রতিবছর ৪১ হাজার নারী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন, সেই তুলনায় মাত্র ৩০০ জন পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

স্তন ক্যানসারের কারণসমূহ

১. যেসব নারীর বয়স ৫০ বছরের বেশি তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
২. মা-খালাদের থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. যেসব মায়েরা সন্তানকে কখনো স্তন্যপান করাননি তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
৪. যাদের তুলনামূলক কম বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয় ও দেরিতে ঋতুস্রাব বন্ধ হয় তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৫. অবিবাহিতা বা সন্তানহীনা নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।
৬. ৩০ বছরের পরে যারা প্রথম মা হয়েছেন তাদের স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৭. একাধারে অনেকদিন (১০ বছর বা বেশি) জন্মনিরোধক বড়ি খেলে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
৮. উপরের কারণগুলো স্তন ক্যানসারের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে থাকে, তাই নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে (৩০ বছর) সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ–

- স্তনের বোটা থেকে কিছু বের হওয়া
- স্তনের ভেতর চাকা (lump) অনুভব করা
- স্তনে ব্যথা অনুভব করা
- স্তনের আকারে লক্ষণীয় পরিবর্তন
- স্তনের ত্বকে ঘাঁ দেখা দেওয়া
- স্তনের ত্বকে লালচে ভাব বা লালচে দাগ দেখা দেওয়া।

উপরের লক্ষণগুলোর যে-কোনো একটি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি, যা স্তন ক্যানসারের ভয়াবহতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সি নারীদের প্রতি তিন বছর পর পর ব্রেস্ট স্ক্রিনিং বা ম্যামোগ্রাম করানো উচিত। ম্যামোগ্রাম হচ্ছে– এক্সরের মাধ্যমে নারীদের স্তনের অবস্থা পরীক্ষা করা। সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার এত ছোটো থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে খুব ছোটো থাকা অবস্থাতেই বা প্রাথমিক পর্যায়েই ক্যানসার নির্ণয় করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে ক্যানসার থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর থাকে। আর এই পরীক্ষার জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। এমআরআই এবং বায়োপসি-এর মাধ্যমেও স্তন ক্যানসার নির্ণয় করা হয়ে থাকে। স্তন ক্যানসারের শনাক্তকরণের পরবর্তী পর্যায় হলো–এর সঠিক চিকিৎসা করা। স্তন ক্যানসারের যে চিকিৎসাগুলো রয়েছে তাহলো– সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও হরমোন থেরাপি, সার্জারির মধ্যেও বিভিন্ন ধরন রয়েছে। কোন ধরনের চিকিৎসা রোগীর জন্য উপযুক্ত তা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন।

জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যানসার ইপিডেমোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন সুদীর্ঘ একযুগ ধরে স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বে সাধারণত পঞ্চাশ বছর বয়সের পর শুরু হলেও আমাদের দেশে অজানা কারণে ৪০-এর পরেই স্তন ক্যানসার দেখা যায়। ডা. রাসকিনের মতে, বিআরসিএ-১ ও ২ নামের জিনের অস্বাভাবিক মিউটেশন ৫ থেকে ১০ শতাংশ দায়ী স্তন ক্যানসারের জন্য।

স্তন ক্যানসারের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তাই ঝুঁকি এড়ানোর জন্য স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা ভালো। এক্ষেত্রে ৩০ বছর পর, প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের পর পর নিজেই নিজের স্তন, পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে এখন ক্যানসারের পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব। বাংলাদেশ ক্যানসার ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি সব জায়গাতেই স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা রয়েছে। সরকারিভাবে স্তন ক্যানসার নিরাময়ে খরচ হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। অনেকে আবার বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই স্তন ক্যানসারকে ভয় না পেয়ে সচেতন হলে রক্ষা করা সম্ভব জীবন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শেখ রাসেলের সবুজ খাতা

রফিকুর রশীদ

পর্দা ঠেলে অফিস কক্ষে পূর্ণিমা ম্যাডাম হন্তদন্ত হয়ে ডেকে ওঠেন– আপা!

টেবিলে ঝুঁকে হেডমিস্ট্রেস কী যেন লিখছিলেন। আগন্তুকের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছে, তবু তিনি চোখ না তুলেই বলেন– বসুন।

পূর্ণিমা ম্যাডাম চেয়ার টেনে বসলেই পারেন, কিন্তু না, তিনি বসেন না। বরং আরও একটু এগিয়ে এসে হেডমিস্ট্রেসের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আবার ডাকেন– আপা!

হাতের কলম টেবিলে নামিয়ে রেখে আপা এতক্ষণে চশমার কাচের ওপার থেকে চোখ তুলে তাকান। অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– কী খবর পূর্ণিমা, এ রকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে! কী হয়েছে?

স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন পূর্ণিমা ম্যাডাম, গলা নামিয়ে বলেন– না, তেমন কিছু না আপা।

– কী ব্যাপার বলো তো! ক্লাসে কিছু ঘটেছে?

হেডমিস্ট্রেসের ভাবনা কেবল স্কুল আর ক্লাস নিয়ে, ছাত্র আর শিক্ষক নিয়ে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলকে তিনি দিনে দিনে সাজিয়ে তুলেছেন মনের মতো করে। তাই সব দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সবকিছুর খোঁজ নেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রায় বছর দশেক পর ক্লাস ফোরের রুটিন বদলে পূর্ণিমাকে দেওয়া হয়েছে ক্লাস-টিচারের দায়িত্ব। সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে বেশ খানিক বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয় শ্রেণি-শিক্ষককে। একটা কিছু সমস্যা হতেই পারে ক্লাসে। কিন্তু পূর্ণিমা ম্যাডাম সেদিকে না গিয়ে টেবিলের উপরে সবুজ রঙের একটা খাতা নামিয়ে রেখে আবেগ জড়ানো কণ্ঠে জানান– হঠাৎ এই খাতাটা পেলাম আপা।

হেডমিস্ট্রেস এবার খাতার দিকে তাকান। সবুজ কভারের খাতা। এ স্কুলের সব ছাত্রই ব্যবহার করে এমন খাতা। খাতার উপরে অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা আছে স্কুলের নাম। তার নিচে ছাত্রের নাম, শ্রেণি-শাখা-রোল ইত্যাদি। এই খাতাটি এমন অসাধারণ কিছু নয়। অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে তেমন কিছু ধরা পড়ে না। তাই তিনি জানতে চান– কিসের খাতা?

– ক্লাস ফোরের বাংলা খাতা।

– তা বেশ। কোথায় পাওয়া গেল!

– পুরানো আলমারি গোছাতে গিয়ে নিচের তাকে পেলাম।

খাতাটা নাড়াচাড়া করতে করতে আরো একটু এগিয়ে ধরেন হেডমিস্ট্রেসের সামনে। এতক্ষণে খাতার উপরে লেখা ছাত্রের নামটি তাঁর নজরে পড়ে। গদিআঁটা চেয়ারের খোড়লের মধ্যে মেরুদণ্ড সোজা করে বসেন। হাত বাড়িয়ে খাতাটা তুলে নেন তিনি, বিস্ময়ে চোখ গোল করে তাকান। তারপর জানতে চান– এতদিন কোথায় ছিল এ খাতা?

– তা তো জানি না আপা!

– জানো না?

– না আপা। আমার জানা নেই। ক্লাস-টিচারের দায়িত্ব গ্রহণের পর সবকিছু গোছগাছ করতে গিয়ে...

বাক্যটা শেষ হয় না পূর্ণিমা ম্যাডামের। হেড-আপা মলিন খাতার উপরে আঙুল ছুঁয়ে গভীর মমতায় বলে ওঠে– নামটা দেখেছ খাতার উপরে?

ফুলের পরাগ ফোটার মতো শিল্পিত ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করেন পূর্ণিমা দাশ– শেখ রিসাল উদ্দিন।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই তার স্কুলের নাম। কিন্তু সবাই চেনে রাসেল নামে।

পূর্ণিমা ম্যাডামের কণ্ঠে অস্ফুটে উচ্চারিত হয়– শেখ রাসেল।

হেডমিস্ট্রেস কিছুই বলেন না। রাসেলের নাম লেখা পুরনো মলিন খাতাটা বুকের উপরে নিয়ে ক্লান্ত শরীর চেয়ারের গহ্বরে হেলিয়ে দেন। চশমার আড়ালে দুচোখ তাঁর নিমীলিত। ধীরে ধীরে সেই চোখের কোনায় জমা হয় অশ্রুবিন্দু। তারপর এক সময় তা গড়িয়ে পড়ে দু গণ্ড বেয়ে। বেদনাপ্লুত এই মানুষটিকে আর বিরক্ত না করে পূর্ণিমা দাশ ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে।

স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পরও হেডমিস্ট্রেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী সেদিন আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারেন না। মনটা তাঁর শ্রাবণ আকাশের মতো ভার হয়ে আছে। রাসেলের সবুজ খাতা তিনি স্কুলে রেখে আসতে পারেননি। কোথায় রাখা যায় ভেবে পাননি। এতদিন চোখের আড়ালে ছিল, এই খাতা নিয়ে কোনো ভাবনা হয়নি। কিন্তু এখন তিনি কী করবেন! লুকিয়ে রাখবেন? কোথায় লুকাবেন? আহা, এত গাঢ় সবুজ মলাটের খাতা! এ কী টিয়ে পাখির মতো প্রগাঢ় সবুজ! নাকি এই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পতাকার মতো স্নিগ্ধ সবুজ! ল্যাবরেটরি স্কুলের সব ছাত্রের হাতে আছে এই একই খাতা। তবু মনে হয় চিরসবুজ রাসেলের খাতার মতো এমন ঘন সবুজ বুঝি আর হয় না। শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে খাতাটি তিনি বাসায় নিয়ে যান।

পড়ন্ত বিকেলে বাসার লনে এসে ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ব্যাগ থেকে খাতাটি বের করতেই তিনি চমকে ওঠেন– কোথায় সবুজ! ফড়িং-পাখার সবুজ নয়, পতাকার সবুজও নয়, কেমন করে যেন রাসেলের সেই খাতার মলাট লাল টকটকে হয়ে গেছে, রক্তের মতো লাল। বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। মাথা

ঝিমঝিম করে। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তবু তিনি চোখ মেলতেই দেখতে পান বাগানের সব জুঁই, বেলি, মল্লিকা– এরা সব গেল কোথায়! কোন জাদুবলে সব ফুল এমন রক্ত রঙিন হয়ে গেল কে জানে সেই কথা!

গোধূলি বেলার রক্তিম আলোয় তিনি এবার রাসেলের খাতার পাতা উল্টান। কী যে সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা লেখা! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাতার পর পাতা জুড়ে লেখা আর লেখা, কোথাও কাটাকুটি নেই বললেই চলে। আবার আছেও একটুখানি। একটি পাতায় চোখ আটকে যায়। কলম ঘষে ঘষে নিজের লেখা এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে, সেই কাটাকুটিতেই বেশ এক রকম ছবির আদল পেয়েছে। মনে মনে ভাবনা হয়– ছেলেটি কি রবীন্দ্রনাথের মতো করে ছবি আঁকার জন্য হাত মকশো করেছে? কিন্তু এ কী, প্রতি পৃষ্ঠায় যে ওর মায়ের নামসই দেখা যাচ্ছে! অভিভাবক হিসেবে ওর বাবা সই করেননি, করেছে ওর মা– ফজিলাতুন নেছা।

বাবার সময় কোথায়! তিনি দেশের প্রধান।

কত রকম কাজ তাঁর! একটুখানি কাছে পাওয়াই ভার। ছেলের স্কুলের খাতা কখন সই করবেন তিনি!

রাজিয়া মতিন চৌধুরীর মনে পড়ে যায়– আগস্টের পনেরোয় বঙ্গবন্ধু আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে, সেই রকমই কথা ছিল। দেশের প্রধান বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রধান। পদের নাম চ্যান্সেলর। বাংলায় বলে আচার্য। অথচ ছাত্রজীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, এখানকার কর্মচারীদের আন্দোলনে সহযোগিতা করার অপরাধে। ইতিহাসের কী যে নির্মম পরিহাস– সেই বহিষ্কৃত ছাত্রটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আসবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই নিয়ে কত তোড়জোড়! ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবার মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে ল্যাবরেটরি স্কুলই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! এই স্কুলের সামনে দিয়েই তো বঙ্গবন্ধু যাবেন। দেশের প্রধানকে এত কাছে পাওয়া তো দুর্লভ এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। পরিকল্পনা হয়–এই স্কুলের পক্ষ থেকেও তাঁকে দেওয়া হবে পুষ্পাঞ্জলি। এই জন্যে সমান আকৃতির ছয় জন স্মার্ট ছাত্র বাছাই করা হয়।

রাসেল তাদের দলনেতা। বেশ কদিন ধরে পুরো দলকে শেখানো হয় কোথায় কীভাবে দাঁড়াতে হবে, কেমন করে এগিয়ে যেতে হবে, কে মালা পরাবে, কীভাবে পুষ্পরেণু ছিটাতে হবে, এই সব নিয়মকানুন। এত সব ট্রেনিংয়ের পরও শেষবেলায় হেডমিস্ট্রেস তাদের দেখতে আসেন, প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলেন কাল সকালে কত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা করতে যাচ্ছে, প্রত্যেকের কাঁধে হাত রেখে নির্দেশ দেন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে চলে আসবে কেমন? রাসেলের সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান, রাসেলের দুহাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলেন– এ কী! তোমার দু'হাতে এত রং কেন?

– রাসেল লজ্জা পায়, মুখ নামিয়ে নেয়। হেডআপা তবু থুতনি ধরে জিজ্ঞেস করেন,

– এত লাল রং কোথায় পেলে?

রাসেল মুখ খোলে। লাজুক ভঙ্গিতে জানায়– পরপর দুই ভাইয়ের বিয়েতে রং– খেলা হয়েছিল, সেই তখন হাতে মেহেদি দেওয়া হয়, তারপর অনেক ধুয়েও রং উঠছে না।

– তাই বলে এত লাল!

লজ্জায় লাল হয়ে যায় রাসেল। নিজের মেহেদিরাঙা হাত টেনে নিয়ে বলে,

– সাবান দিয়ে যতই ধুই, ততই লাল হয়।

হেডআপা এক চিলতে হেসে ওঠেন, রাসেলের সঙ্গে তামাশা করেন– তুমি ঘুমিয়ে গেলে নতুন ভাবি এসে আবার মেহেদি লাগিয়ে দেয় না তো!

লাজুক রাসেল হেডআপার সামনে থেকে পালাবার পথ খোঁজে। আপা সেটা টের পান। সবাইকে বিদায় দেবার আগে আবারো মনে করিয়ে দেন– সকালবেলা সবাই চলে এসো সময়মতো।

পরদিন সকাল হয়েছে ঠিকই। রাতের আঁধার সরিয়ে সূর্য এসেছে আলোর দেয়ালি হাতে। রক্তিম আভায় আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠেছে অন্যান্য দিনের মতোই। কিন্তু সূর্যোদয়ের সেই বর্ণবিভা দেখা হয়নি রাসেলের। রাত পোহাবার সামান্য একটু আগে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে নিভে গেছে তার জীবনবাতি। সূর্যের নয়, মেহেদি রঙের রক্তপ্লাবনে তলিয়ে গেছে সজীব সবুজ রাসেল।

সে রাতে ঘুমোতে যাবার আগে বাবার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় রাসেল।

– কাল সকালে তোমাকে আমি মালা পরিয়ে দেব, আব্বু।

বাবা তো অবাক!

– তুমি পরাবে মালা?

– হ্যাঁ, আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে আমিই দেব ফুলের মালা।

– কী ফুলের মালা? গোলাপ থাকবে তো?

গোলাপপ্রিয় বাবাকে আশ্বস্ত করে রাসেল জানিয়ে দেয়, মালার মাঝখানে থাকবে রক্তগোলাপ। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে রাসেল সানন্দে বলে,

– আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা।

হা হা করে হেসে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। দু'হাতে জড়িয়ে পুত্রের গালে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেন,

– এখন ঘুমাও দেখি, সকালে নেব তোমার লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। এখন চুপচাপ ঘুমাও।

পিতা-পুত্রের মধ্যে সেই বুঝি শেষ সংলাপ, শেষ সাক্ষাৎ এবং হয়ত শেষ আলিঙ্গনও।

সকাল আসার একটু আগেই সব শেষ। রাতের শেষ প্রহরে একদল উন্মত্ত বুনো হাতি তছনছ করে দেয় সাজানো বাগান। ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর ঐতিহাসিক বাড়িটিতে সহসা রক্তের হোলি খেলা করে পথভ্রষ্ট নরপিশাচ সৈনিকের দল। ঘরের মেঝেতে রক্ত, সিঁড়িতে রক্ত, রক্তের ফিনকি এসে দেয়ালের গায়ে এঁকেছে নিষ্ঠুর আলপনা। এত রক্ত ছোট্ট রাসেল সইবে কী করে! মা- বাবা- চাচা, দুই ভাই, মেহেদিরাঙা দুই ভাবি– সব হারিয়েছে তার। শিশুর অন্তরে তবু জাগে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। ঘাতকদের কাছে সে কাতর মিনতি জানায়,'মায়ের কাছে যাব আমি। আমাকে মায়ের কাছে যেতে দাও'।

মায়ের বুকের চেয়ে নিরাপদ ঠিকানা বুঝি আর কোনো শিশুর কাছেই হয় না। অবুঝ রাসেলকে সেই ঠিকানায় পৌঁছে দেবার কথা বলে হিংস্র দানবেরা সহসা রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় বুক। অতটুকু শিশুর বুকের রক্তের ধারা গিয়ে মেশে তার মা- বাবা ভাই-ভাবির রক্তের সঙ্গে। রক্তের রং এত লাল! এত টকটকে লাল! সকালে স্কুল প্রাঙ্গণে বাবাকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানানো হয়নি বটে, তবে কি রাসেল সেদিন সূর্য ওঠার আগেই রক্তগোলাপ শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল!

ভাবতে ভাবতে শুধু ক্লান্ত নয়, ভয়ানক বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন হয়ে পড়েন রাজিয়া মতিন চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ক্লাস ফোরের নতুন ক্লাস টিচার পূর্ণিমা দাশ এতদিন পরে রাসেলের খাতা আবিষ্কার করে তাঁকে এ কোন স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে গেল! এত সব স্মৃতির ঝাঁপটায় তাঁর বিপন্ন সত্তা অতি একান্তে আর্তনাদ করে ওঠে– তুমি তোমার খাতাটি কেন নিলে না রাসেল? এখন এই সবুজ খাতাটি আমি কী করে তোমাকে ফিরিয়ে দিই?

চির অম্লান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

থমকে দাঁড়াল সে দিনের নিশিত রাত্রি
হে অভাগা বাঙালি ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫
ভাগ্যে ঘটেছিল প্রলয়ংকরী বিষাদের করুণ কাহিনি।
সেদিন ছিল পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে
জ্যোৎস্না মাখা তারা ভরা আকাশ
চারদিকে বিছানো ছিল রুপালি চাদর
পুষ্পে ভরা কাননে কানন।
হঠাৎ একরাশ কালো মেঘের দল
জ্যোৎস্না মাখা পূর্ণিমার চাঁদটাকে ঢেকে দিল।
সে দিন ক্ষণিকের জন্যে বাংলার দিক দিগন্ত
আবছায়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো
হলো চারপাশ নীরব নিস্তব্ধ।
বুলেট আর মেশিনগানের শব্দে কেঁপে উঠল ঢাকা শহর।
ভোরের কাক ও কোকিলের ডাক থেমে গেল
থেমে গেল পাখপাখালির কিচিরমিচির।
ধানমন্ডির লেকের পানি আছার তুলল
মাছেরা চলতে চলতে খায় ডিগবাজি,
বন্ধ হয়ে গেল বেগমান পানির স্রোতধারা।

দেশ আমায় ভালোবাসায় জড়ায়

দেলওয়ার বিন রশিদ

জমিতে পাটের চারা মাথা তুলে উঁকি দেয়,
খররোদে বৈশাখে ক্ষেতের আইলে দূর্বা ঘাস রঙচটা
গাছের উঁচু ডালে একটানা ঘুঘুর ডাক
আম-কাঁঠালের মউ মউ গন্ধ
জৈষ্ঠ্যে ছড়ায় সুখ।
আষাঢ়ে মেঘলা সকাল
রিমঝিম বৃষ্টি
খালবিলে মাছের ঝাঁক
নদীতে পালের নাও
কদম কেয়ার গন্ধ চারদিকে
শ্রাবণে বিলেঝিলে শাপলা-পদ্মের অপরূপ হাসি
শরতে শিউলি ঝরে
নদীর দু'ধারে কাশফুল হাসি ছড়ায়
আকাশে সাদা তুলো মেঘ উড়ে ঘুড়ি হয়ে,
ঝাউবনে ঝিরিঝিরি বয়ে যায়
বাউরি বাতাস,
দুপুরে ডাহুক ডেকে যায়
হেমন্তে ধানের ক্ষেতে সোনার ফসল
কৃষকের স্বপ্ন আশা,
শীত এসে ছুয়ে যায় প্রকৃতি
পিঠা উৎসব জমে,
বসন্তে বাগ-বাগিচার পুষ্প সৌরভে মউ মউ করে
ফোটে পলাশ শিমুল
মাঠে মাঠে ফসলের সম্ভার
এ আমার দেশ প্রতিক্ষণ ভালোবাসায় জড়ায়।

রাজকুমারের গল্প

শাফিকুর রাহী

একদিন এক রাজকুমার ধানমন্ডির লেকে,
জোছনা রাতে ঘুমের ঘোরে দারুণ স্বপ্ন দেখে।
দূর আকাশে তারার মেলায় চাঁদের বুড়ি হাসে,
রাজকুমারের স্বপ্ন ও সুখ মেঘের কোলে ভাসে।
কোনো বাধা মানবে না সে বীরের বেশে ছুটবে,
বিশ্বজয়ের গান শোনাবে গোলাপ হয়ে ফুটবে।
রাজকুমারের মনের ভেতর জগৎ জয়ের গান,
প্রজাপতির ডানায় চড়ে যাবে দূর আসমান।
অচিন দেশে পাড়ি দেবে ফিরবে বীরের বেশে,
বুকজুড়ে তার স্বপ্ন যত দেশকে ভালোবেসে।
হঠাৎ একি মধ্যরাতে বর্গি দিল হানা;
রক্তবানে ভাসলো বাড়ির সবুজ উঠোনখানা।
সেদিন থেকে রাজকুমারের শোকেই কাঁদে পাখি,
কী হলো হায়– দেশজনতা অবাক চেয়ে থাকি।
কাঁদলো আকাশ মাটি মানুষ, কাঁদলো সারা ভুবন,
দূর বিদেশে স্বজন শোকে ডুকরে কাঁদে দু'বোন।
রাজকুমারের নামটি আছে ইতিহাসের পাতায়–
রাসেল সোনা; নামটি লেখা আমার গান কবিতায়।

একাকী আমি

শাহরিয়ার নূরী

সন্ধ্যা রাতের ঘরের দিকে হেঁটে চলে
বেলা শেষ হলো, ঐ এল পাড়ের ডাক
খেয়া নৌকা বাঁধা ঘাটে
একলা আমি হেঁটে চলি
ফেরারি পাখি ডাক দিয়ে যায়
আমার পাট চুকলো ঘরের মায়ার।
এত দিনের গৃহস্থ জীবন
মায়াবী চাবির গুচ্ছ ছড়িয়ে দিলাম
মাঠভরা শস্য ক্ষেতে।
চলতে চলতে পথ ফুরাবে না কোনোকালে
চকিতে চাতক কি পাবে তৃষার জল!

কাব্য প্রেমিকা

প্রত্যয় জসীম

বৈশাখি সন্ধ্যায় রুপালি মেঘেরা কাঁদে
নগরী অচল হঠাৎ জলের ফাঁদে...
জলের আড়ালে খুঁজি মেঘের শরীর
আহারে বৈশাখি দিন বৃষ্টি ঝিরঝির...
কবির বুকেতে কার হিমহিম জল
মেঘে মেঘে কার ছবি করে টলমল
বৃষ্টি তুমি সঙ্গী থেকো মৌল কবিতার
বৃষ্টি তুমি সঙ্গী থেকো কাব্য প্রেমিকার...।

পতাকার উচ্চতায়

খান চমন-ই-এলাহি

তাঁর কোনো দেশের বাড়ি নেই
তাঁর বাড়ি টুঙ্গিপাড়া-বাংলাদেশের সমান!
কার জন্য বলা যায় এমন কথা
কার জন্য বাইগার পাড়ের একটি গ্রাম
দীর্ঘ হতে হতে সাতান্ন হাজার বর্গ মাইল!
আমরা বিরতিহীন যে কথা বলতে পারি
ঘাঘর-মধুমতীর মতো তেরশ নদীর তীর ধরে
এবং অপার প্রেম, জীবন ঘনিষ্ঠতায়
সবুজ ক্যানভাসে বুকের রক্তে যিনি লেখেন,
আমি বাঙালি
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি
তিনি আর কেউ নন; বুকের গভীরে জ্বলজ্বলে
পতাকা সম উচ্চতায়
শেখ মুজিবুর রহমান।

শারদীয় প্রাতে

শাহনাজ

শারদীয় প্রাতে মেঘেরা গোল্লাছুট খেলায়
মেতে উঠেছে, ঐ দেখ মেঘেমেঘে কেমন গলাগলি
দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে,
যেতে যেতে বহুদূর...
তুলার মতো সাদা মেঘ
উড়ে যায়, ভেসে যায়।
আমার মন কেমন করে, কেমন করে
আজকের এই শারদীয় প্রাতে
তুমি জানো কি আমার মন ছুটে যায়
ঐ পাহাড়ের ঢালে, ঘুমের নদী পড়ে থাকে
স্বপ্নমাখা এক প্রাতে।

কোভিড-১৯

আল মামুন

সারা বিশ্বে চলছে এক মহামারি
বেড়েই চলছে মৃত্যুর ছড়াছড়ি।
চীনের উহান শহরে তার উৎপত্তি
কে জানে কবে হবে তার নিবৃত্তি।
নামকরণ হয়েছে তার করোনা।
করোনা হলে থাকে না স্বাদ-ঘ্রাণ
যাকে ধরে সহজে ছাড়ে না।
তাই কি সে কেড়ে নেয় প্রাণ?
কবে হবে প্রতিষেধক আবিষ্কার
যার জন্য পাবে বড়ো পুরস্কার।
বিশ্ব থেকে করোনা দূর কর প্রভু
তোমার ডাকে পিছপা হবো না কভু।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী

মো. জসিম উদ্দিন

হে বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান,
তোমার জন্মশতবার্ষিকী ২০২০ সাল।
সেজেছে নতুন সাজে সারা বাংলা,
শহর-বন্দর-গ্রামগঞ্জ কিবা পাড়াগাঁ।
তোমার জন্মশতবার্ষিকীর আগমনে,
নতুন সূর্য উদিত বাংলার আকাশে।
আপন আলোয় আলোকিত করে,
আকাশ-বাতাস তরুলতা মাতোয়ারা সানন্দে।
তোমারই সুযোগ্য কন্যার হাতে,
বীর বাঙালির নতুন হাল দিয়েছে তুলে।
তাই তো তোমার সম্মান,
দিতে চায় বাংলার জনগণ।

ভাদ্র-আশ্বিন

সাদিয়া সুলতানা

শরতের রানি শিউলি কাশফুল
শুধু শুভ্রতা, মলিনতা ধুয়ে যায়
মুছে যায় জীর্ণতা, জীবনের জঞ্জাল।
সমুদ্রের বিছানায় নীল পেতেছে শয্যা
লাজুক হেসে নিজেকে লুকায় মেঘের বনে।
হিমহিম সমীরণ আর নীলাঞ্জনার উঠোন
ভরে ওঠে কলাপাতার সবুজ কোমলতায়
গলাগলি ভাদ্র-আশ্বিনে।

শরৎ ছাড়া এমন দৃশ্য

গোলাম নবী পান্না

হাওয়ার পরশ ঢেউ খেলে যায় কাশফুলেরই ক্ষেতে
চোখের পাতায় মেলে ধরে সাদা চাদর পেতে।
সেই চাদরে ঢেকে পড়ে সবুজ ক্ষেতের আল
ক্ষেতের পাশে নৌকা চলে ছোট্ট চিকন খাল।
নৌকা খালে যায় না দেখা ভাসে পালের রেখা
কাশের আড়াল বলেই এমন পাল হেঁটে যায় একা।
দেখতে হলে সেই সে ছবি আমার গাঁয়ের বাঁকে
ঠায় দাঁড়াতে পারবে না আর দেখবে তোমার ডাকে।
চুপটি বসে থেকো না তাই রূপটি দেখি চলো
শরৎ ছাড়া এমন দৃশ্য কে দেবে আর বলো।

একলা আমি একলা দুপুর

রাবেয়া নূর

দক্ষিণ দিগন্তে যখন নিরালায় উড়ে যায় সাদা চিল
আমার হৃদয় ডানা মেলে তোমার মাঠ ভরা সবুজ
প্রান্ত ছুঁয়ে। আকুলতায় বর্ষা ঝরে
মেজেন্টা রঙের জারুল বনে।
লাল-কমলা রং তোমার ভারি পছন্দের
আমার মেজেন্টা ভোগেনভ্যালিয়া।
প্রতিদিন দুপুর হেঁটে যায় বিকেলের দিকে
আমি যাই তোমার দিকে।

শেখ রিসাল উদ্দিন
বশিরুজ্জামান বশির

ধানমন্ডি বত্রিশে–
রাসেল নাকি থাকে
সেই খবরে শিল্পী-কবি
হাজার ছবি আঁকে।
হাসু আপা খুঁজে বেড়ায়
রাসেল ভাইয়া কই
তোমার জন্য আনছে আপু
বিন্নি ধানের খই!
শহিদ শেখ রিসাল উদ্দিন
কে জানে তার নাম
বাংলাদেশে শেখ রাসেল
কষ্ট চিঠির খাম।

রাসেল আছে
ফরিদ আহমেদ হৃদয়

রাসেল আছে সবার প্রাণে
ওই আকাশের তারার মাঝে।
বাংলা মায়ের সবুজ মাঠে
আছে নানান ফুলের গাছে।
রাসেল আছে স্বপ্ন-ধ্যানে
বেঁচে আছে দেশের গানে
আছে আরো মেঘের ছায়ায়
নিত্য ভোরের পাখির কলতানে।
রাসেল আছে খেলার মাঠে
স্কুলে ওই ঘণ্টা বাজার সুরে
ধানমন্ডির ওই ঝিলটার পাশে
বত্রিশ নম্বর বাড়ির ছায়ায় মুড়ে।
রাসেল আছে বোনের মনে
স্মরণ করি তাকে ক্ষণে ক্ষণে
যত দিন রবে বাংলাদেশ
থাকবে রাসেল বাংলার ঘরে ঘরে।

শেখ রাসেল
মুহাম্মদ ইসমাঈল

রাসেল ছিল শান্তশিষ্ট
অত্যাচারে হয় অতিষ্ঠ
স্বাধীনতার জন্য জীবন
যায় তো চলে যাক
ডাক দিয়েছে শেখ মুজিবুর
বিশ্ব তো অবাক।
বয়সে কি মানুষ বাঁচে
মানুষ বাঁচে কর্মে
সত্যিকারের মানুষ বাঁচে
দেশ-জনতার মর্মে ॥

তুলসি পাতা
রুস্তম আলী

অনন্ত সিন্ধুর অনন্ত গতি
গঙ্গার জল পবিত্র অতি
তুলসি পাতার বিধৌত স্নিগ্ধ জলে
মানবাত্মা–
স্নান করে সমাপন–
আঁধারে পাপ করে মোছন
গঙ্গার জল গঙ্গায়ই করে বিচরণ।
উদাস– উদাস মন
চঞ্চল পাপী
সদা–সর্বদা করে আত্মার ক্ষতি।
ধার্মিকের সুখ–
পরহিত জীবন রাখে বাজি
কিছু নাহি করে আশা
আপনার লাগি।
তোমার আত্মা–
সিঁদুর, তুলসি পাতা ও চন্দন
তাই তো তোমার সাথে
আমার হৃদয়ের বন্ধন।
বেহেশত-দোজখ, স্বর্গ-নরক
এ দেহ মাঝে–
আপনালয়ে যে যেভাবে সাজে
তুলসি পাতা, তুলসি গাছেই থাকে।

সকাল সমীরণে
মো. হযরত আলী

সকাল সমীরণে
রবির কিরণে
প্রফুল্ল মনে
ভবের খেলাঘরে
জীবন সংগ্রামে
ভুলভ্রান্তির কারণে
বেলার অবসানে
মুক্তির সন্ধানে
আকুল মনে
ক্ষণে ক্ষণে
মুক্তি না নিলে
হবে প্রাণদণ্ড!
মুক্তি দাও হে প্রভু
তোমার নিজ গুণে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২০ বঙ্গভবনে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত Espen Rikter-Svendsen পরিচয়পত্র পেশ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সমগ্র জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করছে সরকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সরকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শতভাগ উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, বর্তমান বৈশ্বিক মহামারিতে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে ইতোমধ্যে কোমলমতি শিশুদের জন্য একযোগে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' শিখন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য– 'Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond: The role of educators and changing pedagogies' অর্থাৎ 'কোভিড-১৯ সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা' চলমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

দেশীয় মাছ সংরক্ষণের এগিয়ে আসার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২রা সেপ্টেম্বর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের অংশ হিসেবে বঙ্গভবনে সিংহ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বলেন, মৎস্য খাত দেশের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি খাত। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ খাতের সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি রুই, কাতলা, পাবদা, গুলশা,

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২রা সেপ্টেম্বর ২০২০ বঙ্গভবনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন–পিআইডি

মহাশোলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমসহ অন্যান্য কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, নৌবাহিনী সদর দপ্তর এবং বিমানবাহিনী সদর দপ্তর প্রান্তে সশস্ত্রবাহিনী নির্বাচনি পর্ষদ ২০২০ (১ম পর্ব)-এর সভায় বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই সেপ্টেম্বর 'আর্মড ফোর্সেস সিলেকশন বোর্ড মিটিং ২০২০'-এ গণভবন থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন একটা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সেলক্ষ্যে সবদিকে নজর রেখে সশস্ত্রবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তারা যাতে সব ধরনের প্রশিক্ষণ পায় এলক্ষ্যে বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করেন এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে উপযুক্ত কর্মকর্তারা যাতে, ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমোশন দেওয়ার আহ্বান জানান।

দুর্যোগ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে বৈশ্বিক অভিযোজন কেন্দ্রের (গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডপটেশন–জিসিএ) আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ভূমিধস, হিমবাহে ধসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে দক্ষিণ এশিয়া। তিনি দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়াকে দুর্যোগে টিকে থাকার সক্ষমতা আরো বাড়ানোর এবং বিভিন্ন দেশকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিশ্রুত জাতীয় সহায়তা বৃদ্ধিরও আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থায় জিসিএ'র ঢাকা অফিস 'সেন্টার অব একসিলেন্স' একটি সমাধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

মন্ত্রিসভায় ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে যুক্ত হন। বৈঠকে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) খসড়ায় অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এছাড়া বৈঠকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ৩ মাস আগে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং মেয়র ও কাউন্সিলরদের ছুটির সময় কমিয়ে আনার বিধান রেখে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) সংশোধন আইন ২০২০, পাঁচ কেজির বেশি ওজনের ড্রোন ওড়াতে অনুমতি লাগবে, এমন বিধান রেখে 'ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা ২০২০'-এর নীতিগত খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন সরকারিভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে। একইসঙ্গে 'ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ফ্যাসিলাইটেশন অব ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড ইন এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক' শীর্ষক একটি প্রস্তাবেও অনুসমর্থন জানায় মন্ত্রিসভা।

জলবায়ু তহবিলে অর্থ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই সেপ্টেম্বর 'এফ-২০ ক্লাইমেট সলিউশন উইক' উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অভিযোজন তহবিল বাড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৃহত্তর সহযোগিতা, শক্তিশালী ও গ্রিন মেকানিজম এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকার মিন্টুরোডস্থ সরকারি বাসভবনে মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে টেলিভিশন কলাকুশলীর নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অকৃত্রিম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অকৃত্রিম। এটির সাথে অন্য কারোর সম্পর্কের তুলনা হয় না। ২রা সেপ্টেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশের বিদায়ি সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার এসময় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, এটা হাইকমিশনারের বিদায়ি সাক্ষাৎ ছিল এবং তিনি সচিব মর্যাদায় পদোন্নতি পেয়ে দিল্লি যাচ্ছেন। তার এ পদোন্নতিতে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

তথ্যমন্ত্রী এসময় সদ্যপ্রয়াত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন ও তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক জানান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হচ্ছে। হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশের ঢাকা অবস্থানকালে আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। বিশেষ করে বহু বছরের আলাপ-আলোচনার পর গত বছর থেকে ভারতে প্রথমবারের মতো আমাদের বিটিভি পুরো ভারতবর্ষে ফ্রি ডিশের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালাও সেখানে সম্প্রচার হচ্ছে। এগুলো বড়ো কাজ, বহু বছর ধরে যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চললেও আগে জট খোলেনি। সমস্ত জট খুলে এগুলো করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধুর ওপর একটি বায়োপিক নির্মিত হচ্ছে। কোভিডের কারণে এর কাজ আপাতত বন্ধ আছে, তবে খুব সহসাই কাজ শুরু হবে। এছাড়া দু'দেশের যৌথ প্রযোজনায় মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি ডকুমেন্টরি ফিল্মও শুরু হবে বলে জানান তিনি।

হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী বলেন, আগামী বছর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর এবং দু'দেশের সম্পর্ক অনেক প্রাচীন হলেও ২০২১ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কেরও ৫০ বছর হবে। দু'দেশের অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে দুই দেশ একসাথে কাজ করতে পারে।

টিআরপি নির্ধারণে কাজ করছে কমিটি

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, টিআরপি ব্যবস্থাকে নিয়ম-নীতির মধ্যে আনতে তিন মাস আগে থেকে তথ্য মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। আমরা একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। এই কমিটি সুপারিশ করবে কীভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে টিআরপি নির্ধারণ করা হয়, সেই পদ্ধতিতে আমাদের দেশে কীভাবে টিআরপি নির্ধারণ করা যায়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় তথ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে টেলিভিশন শিল্পী কলাকুশলীদের বিভিন্ন সংগঠনের জোট 'ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশন'(এফটিপিও) নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিদেশি দ্বিতীয় শ্রেণির শিল্পী কলাকুশলীদের দিয়ে বাংলাদেশের পণ্যের বিজ্ঞাপন বানিয়ে প্রদর্শন করাতে বাংলাদেশের শিল্পীরা বঞ্চিত হয়, শিল্প বঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যারা অভিনয় করে, বিজ্ঞাপনে মডেল হয়, তারা অনেক স্মার্ট, দেখতেও সুন্দর। কিন্তু এরপরও কোনো কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রবণতা থাকে আশপাশের দেশ থেকে এগুলো বানিয়ে আনা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সেটি আমরা বন্ধ করব না, কিন্তু একটি নিয়ম-নীতির আওতায় আনা হবে। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, শিল্পীদের জন্য শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আছে, সেই কল্যাণ ট্রাস্ট সবার জন্য। টেলিভিশন, মঞ্চ, যাত্রার জন্য তো আলাদা আলাদা শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট করা যাবে না। সেটি পরিচালনার দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্র শিল্পীদের জন্য চলচ্চিত্র শিল্পী ট্রাস্ট গঠন করেছেন। এই দুই ট্রাস্ট থেকে টেলিভিশন শিল্পীরাও কীভাবে এর থেকে সহায়তা পায় সেটা নিয়েও আমরা কাজ করছি।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষর এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সংশোধন

১লা সেপ্টেম্বর: বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সংশোধনের ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। বৈঠকে নীতিমালা সংশোধন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা হয়েছে।

বন্যায় নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে একশ কোটি টাকা বরাদ্দ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, চলতি মৌসুমে তিন দফা বন্যায় ৩৩টি জেলায় পাঁচ হাজার ৭৭২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের একশ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার।

৬টি প্রকল্প অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটি-একনেক ৬ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ছয়টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক

২রা সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

সশস্ত্রবাহিনী পর্ষদ ২০২০

৭ই সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনী নির্বাচনি পর্ষদের সভায় অংশ নেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল–'কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন–শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা'।

ডিএফপি'তে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার উদ্‌বোধন

৯ই সেপ্টেম্বর: তথ্যসচিব কামরুন নাহার ডিএফপি'র তথ্যভবনে নবনির্মিত প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

১০ই সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও বিভিন্ন সংগঠন ভার্চুয়াল নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে এ দিবসটি।

করোনায় আর্থিক সংকট মোকাবিলায় স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাবেন আইনজীবীরা

১৩ই সেপ্টেম্বর: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় আড়াই মাস আইনজীবী বিশেষ করে জুনিয়র আইনজীবীরা তাদের কাজ করতে না পারায় অনেকেই আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছেন। তাদের এই কষ্ট লাঘবের জন্য স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আইনমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফরিদপুরে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আট তলাবিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্‌বোধন করেন।

বাউনিয়াবাদে বাস্তুহারা পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্পের দলিল হস্তান্তর

ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বর সেক্টরের বাউনিয়াবাদ এলাকায় দুই হাজার ৬০০ বাস্তুহারা পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্পের প্লটের দলিল হস্তান্তর করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তুরস্কের আঙ্কারায় নবনির্মিত বাংলাদেশ দূতাবাস কমপ্লেক্সের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

তুরস্কে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় বাংলাদেশ মিশনের চ্যান্সারি উদ্‌বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাসভবন গণভবন থেকে এ উদ্‌বোধন করেন। এসময় তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের শিকড় অনেক গভীরে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৫০ বছর আগে ১৯৭৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্কের শুরু হয়। তবে আমাদের সম্পর্কের শুরু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি জেনারেল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে।

দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের জনগণের দ্বিপক্ষীয় সুবিধার জন্য বাংলাদেশ তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে আগ্রহী। আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাস ভবন নির্মাণ ও রোহিঙ্গা সংকটসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সহযোগিতার জন্য তুর্কি প্রেসিডেন্ট ও তুর্কি ফার্স্ট লেডিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ঢাকায় সম্প্রতি নির্মিত তুর্কি দূতাবাস এই মুজিববর্ষেই প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সদয় উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের আশা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশকে লক্ষাধিক ডোজ ভ্যাকসিন দেবে চীন

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে আশ্বস্ত করে চীন বলেছে, বেইজিং-এর চারটি করোনা ভ্যাকসিন শেষ ধাপের ট্রায়ালে পৌঁছেছে। এর যে-কোনো একটি ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং কার্যকর প্রমাণিত হলে সবাই সেগুলো পাবে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে এক লাখেরও বেশি ডোজ ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে চীন।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) নির্বাহী পরিচালক ডা. জন ডি. ক্লেসেন্স বলেন, বেইজিংভিত্তিক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সিনোভ্যাক বায়োটেক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ৪ হাজার ২০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চালাবে। চীনা এই কোম্পানি বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি ডোজ দেবে।

চীন থেকে ভ্যাকসিন এলেই দেশে ট্রায়াল শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে ট্রায়ালের জন্য ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে কল সেন্টার। যারা ২৪ ঘণ্টা ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হলেই সমাধান দেবেন। বাংলাদেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর জন্য কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করেছে চীন। অনুমোদন পেলেই ভ্যাকসিনগুলো পাঠানো হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

হিন্দু বিধবাদের সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে ঐতিহাসিক রায়

স্বামীর কৃষিজমিতে ৮৩ বছর ধরে কোনো প্রাপ্য ছিল না হিন্দু বিধবাদের। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে এ অসঙ্গতি দূর করে ২রা সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক রায় দিল হাইকোর্ট। হিন্দু বিধবা নারীরা

শুধু স্বামীর অকৃষিজমিই (বসতভিটা) নয়, কৃষিজমিরও অংশীদারিত্ব পাবেন বলে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেয়। এতদিন বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকারিত্বে যারা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে শাস্ত্রমতে পিণ্ডদান করতে পারে তারাই মৃত ব্যক্তির একমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত। এতকাল সম্পত্তিতে এদেশের হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ রায়ের ফলে হিন্দু নারীরা সেই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পেলেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ রায়ের ফলে ৮৩ বছরের গ্লানি থেকে মুক্ত হলো বাংলাদেশ। এ রায়ে শুধু হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতিই নয়, বাংলাদেশের মর্যাদাও বেড়েছে।

কুমিল্লা-সোনামুড়া নদীপথ চালু

৫ই সেপ্টেম্বর গোমতী নদীপথে বাংলাদেশ থেকে সোনামুড়া গেল ১০ মেট্রিক টন সিমেন্ট। গোমতী নদীপথে কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে ভারতের ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া পর্যন্ত পণ্য আমদানি-রপ্তানি হবে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ভারতেরও আগ্রহ থাকায় এই নৌপথ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দাউদকান্দি থেকে গোমতী নদী দিয়ে তিতাস মুরাদনগর, দেবীদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, বুড়িচং, কুমিল্লা সদর ও বিবিরবাজার হয়ে সোনামুড়ায় গেছে সিমেন্ট বোঝাই নৌযানটি। সাধারণত দুদেশের মধ্যে ট্রাকে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়। নৌপথ চালু হলে তা হবে সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। কুমিল্লার দাউদকান্দি, তিতাস, মুরাদনগর, দেবিদ্বার, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া ও আদর্শ সদর উপজেলার বুক চিড়ে বয়ে গেছে গোমতীর ৯২ কিলোমিটার নৌপথ। এর মধ্যে প্রায় ৮৯.৫ কিলোমিটার বাংলাদেশ অংশে এবং অপর অংশ ভারতের ত্রিপুরা এলাকায়। এদিকে বাংলাদেশ থেকে নদীপথে রপ্তানি হওয়া মালামালের চালান গ্রহণের জন্য সোনামুড়ায় একটি ভাসমান জেটি নির্মাণ করা হয়। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের সোনামুড়া এলাকায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন– ত্রিপুরা রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, শিল্প সচিব কিরণ গীত্তা, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ক্রিটি চাকমা প্রমুখ। বাংলাদেশ অংশে কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার বিবিরবাজার স্থলবন্দর এলাকায় বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক।

দীর্ঘদিন পর রিকশা-ভ্যান নিবন্ধন

রিকশাসহ অযান্ত্রিক যানবাহনের নিবন্ধন দেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ১৩ই সেপ্টেম্বর নগর ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

যানজটের কারণ হিসেবে রিকশা-ভ্যানকে দায়ী করে দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীতে এই বাহনটির নতুন লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ রেখেছে দুই সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি ও ডিএনসিসি)। কিন্তু রাজস্ব বাড়ানোর কথা চিন্তা করে এবার সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। চলতি অর্থবছর থেকে নতুন করে রিকশাসহ অযান্ত্রিক সব যানবাহনের নিবন্ধন বা লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। একইসঙ্গে ডিএসসিসি এলাকায় মোটর যন্ত্র, ইঞ্জিন বা ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ২৪ কোটি টাকা। ডিএসসিসি বলছে, লাইসেন্স না থাকলেও অযান্ত্রিক অবৈধ এসব বাহন বন্ধ হচ্ছে না। তাই এগুলোকে নিবন্ধন দেওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলার মধ্যে এনে পরিচালনা করা হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

জাতিসংঘের ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার পেল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার ২০২০' অর্জন করেছে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নবম বার্ষিক পুরস্কারের এ আয়োজনে ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে বিসিসি'র বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) টিম তাদের ই-রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্মের

(erecruitment.bcc.gov.bd) জন্য এ পুরস্কার অর্জন করে। ৭ই সেপ্টেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'ডব্লিউএসআইএস ফোরাম-২০২০ প্রাইজেস অ্যাওয়ার্ড সিরেমনি' অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়নের (আইটিইউ) মহাসচিব হাওলিন ঝাও এ পুরস্কারের ঘোষণা দেন।

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা বাড়ল

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশের (এনপিএসবি) মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা বাড়ানো হয়েছে। এর আওতায় ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে একজন গ্রাহক প্রতিদিন পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন। একবার লেনদেন করা যাবে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা। দৈনিক মোট ১০টি লেনদেন করা যাবে। ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ৬ই সেপ্টেম্বর এক নির্দেশনা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিন ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা যাবে। প্রতিবার লেনদেন করা যাবে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা। দৈনিক মোট ২০টি লেনদেন করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছে।

৯২টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে নিবন্ধনের অনুমতি

দেশের ৯২টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে নিবন্ধনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে সরকার। ৩রা সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। ৯২টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টালের মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৫৭টি, ময়মনসিংহের ২টি, চট্টগ্রামের ১০টি, রাজশাহীর ৪টি, রংপুরের ৪টি, খুলনার ৪টি, বরিশালের ৪টি ও সিলেট থেকে প্রকাশিত ৭টিকে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব বাণিজ্যে রপ্তানি আয়ে ২০ পণ্যে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

করোনা সংকটের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে ধীরগতি দেখা দিলেও রপ্তানি আয়ে চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশ। নিট পোশাক, হালকা

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের কাছে ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে edotco Bangladesh Co.Ltd. *এর প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশের চেক হস্তান্তর করেন–পিআইডি*

প্রকৌশল পণ্য, কৃষিপণ্য, ওষুধ, শুকনো খাবারসহ ২০ ধরনের পণ্যতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী আগস্টে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯৬৭ মিলিয়ন ডলার। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালের আগস্টে রপ্তানি আয় হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

করোনা সংকটের মধ্যেও জুলাইয়ে ২১টি পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আগস্টেও ২০ ধরনের পণ্য রপ্তানি আয় বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে চা রপ্তানিতে যা প্রায় ১১৩ শতাংশ।

এরপর ৯২ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল শুকনা খাবারে, জুট ইয়ার্ন রপ্তানিতে ৬৭ শতাংশ, কার্পেট ৬৩ শতাংশ, হ্যান্ডিক্রাফটস ৬০ শতাংশ, প্রকৌশল যন্ত্রাশ ৫৬ শতাংশ, গুঁড়া মশলা ৫২ শতাংশ, পাট ও পাটজাত পণ্যে ৫০ শতাংশ, হোম টেক্সটাইল ৪৪ শতাংশ, ইলেকট্রিক পণ্য ৩৪ শতাংশ, কৃষিপণ্যে ৩৩ শতাংশ রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানি আয় বেড়েছে এমন পণ্যগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে– ওষুধ, জুতা (চামড়া ব্যতীত), ফার্নিচার, কেমিক্যাল পণ্য, বাইসাইকেল, রাবার ও নিট পোশাক।

যুক্তরাজ্যের বাজারে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা

যুক্তরাজ্যের বাজারে 'ধোলাইখাল-জিঞ্জিরা' খ্যাত যন্ত্রাংশ তৈরির লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল শিল্প পণ্য রপ্তানির বিশাল সম্ভাবনা দেখছে বাংলাদেশ। পুরান ঢাকার টিপু সুলতান রোড থেকে গড়ে ওঠা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলো এখন ছোটোবড়ো মেশিন তৈরি করছে। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে হচ্ছে রপ্তানি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের চাহিদা বাড়ছে।

হালকা প্রকৌশল শিল্পের সংগঠন বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইআইওএ) সভাপতির মতে, বিশ্বে লাইট ইঞ্জিরিয়ারিং পণ্য রপ্তানির অন্যতম বাজার ইউরোপ। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সেখানে গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ রপ্তানি সম্ভব। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন জাপান ও জার্মানির বিকল্প মেশিন তৈরি করছে। বিইআইওএ-এর তথ্য মতে, বর্তমানে ছোটোবড়ো মিলিয়ে সারা দেশে প্রায় ৪০ হাজার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ উৎপাদনশীল আর ৯০ শতাংশই সেবা ও মেশিন মেরামতের কারখানা। এতে মোট কাজ করছে প্রায় ১৬ লাখ শ্রমিক। প্রায় ১৪ দশমিক ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে গড়ে ওঠা এই হালকা প্রকৌশল শিল্পের দেশীয় বাজার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

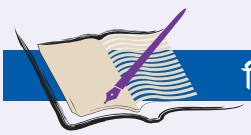

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এমপিও শিক্ষকদের বেতন হবে মোবাইলে

বেতন পাওয়ার বিষয়টি সার্বিকভাবে দ্রুত, সহজ ও ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ঝামেলা এড়াতে এমপিওভুক্ত প্রায় ৫ লাখ শিক্ষকের বেতন মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এলক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগ একযোগে কাজ করছে। এতে সরকারের ব্যয় হবে ২০০ কোটি টাকা। এজন্য এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন–পিআইডি

উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১লা সেপ্টেম্বর শিক্ষা বিষয়ক সাংবাদিকদের এক অনলাইন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করে শুধু চাকরি না খুঁজে উদ্যোক্তা হওয়ার আহ্বান জানান। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সরকার কারিগরি শিক্ষায় জোর দিচ্ছে এবং সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তত দুটি ট্রেড বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন জানান, দেশে সাক্ষরতার হার শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ হয়েছে। গত বছর এই হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপে সাক্ষরতার এই হার উঠে এসেছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

সিলেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন

'আর টিএম আল-কবির টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি' নামে সিলেট সদরের টুলটিকর ইউনিয়নের টিবি গেইটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দিয়ে আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৭টি। ২৩টি শর্তে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত তুরস্কের

তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভুসোগলু। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ১৪ই সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

শিক্ষা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদারকরণসহ দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, উভয় দেশের সম্পর্কের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এসময় তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাহরাইনের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস, আইসিটি, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন সেক্টরে বাহরাইনের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম। ১৪ই সেপ্টেম্বর ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাহরাইন চেম্বারের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় রাষ্ট্রদূত এ আহ্বান জানান। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন বাহরাইন চেম্বারের চেয়ারম্যান সামীর নাস, সিইও শাকের ইব্রাহিম প্রমুখ।

বাহরাইন চেম্বারের চেয়ারম্যান সামীর নাস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিশেষ করে তিনি ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরে বাংলাদেশি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বাহরাইনে উৎপাদন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এলক্ষ্যে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সফর আয়োজন এবং নেতাদের অংশগ্রহণে অচিরেই একটি ওয়েবিনার বা অনলাইন মতবিনিময় সভা আয়োজনে রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাবে বাহরাইন চেম্বারের চেয়ারম্যান আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার ব্যাপারে উভয়পক্ষই সম্মত হন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদের তালিকায় বাংলাদেশের মেরিনা

বিশ্বের শীর্ষ ১০জন চিন্তাবিদের তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা সাময়িকী *প্রসপেক্ট*-এর করা বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকা থেকে শীর্ষ ১০ জনের তালিকা

প্রকাশ করা হয় ২রা সেপ্টেম্বর। প্রকাশিত সে তালিকায় শীর্ষ তিনে রয়েছেন মেরিনা তাবাসসুমের নাম।

মেরিনা তাবাসসুম স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে হালকা ওজনের বাড়ি নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন যা পানির উচ্চতা বাড়লে স্থানান্তর করা সম্ভব। তাঁর সম্পর্কে *প্রসপেক্ট* বলছে,'বাস্তব সমস্যার দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি কাজ করছেন। তিনি এমন ধরনের ঘরবাড়ির নকশা করেছেন, যা পানির উচ্চতা বাড়লেও মানুষকে নিরাপদ রাখবে'। উল্লেখ্য, মেরিনা ২০১৬ সালে জিতে নেন স্থাপত্যের জন্য সম্মানজনক আগা খান পুরস্কার। ২০১৯-এ পেয়েছেন তিনি যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘর আয়োজিত 'জামিল প্রাইজ'।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকায় মিরপুর বাউনিয়াবাদে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ২৬০০ বাস্তুহারা পরিবারের নিকট পুনর্বাসন প্রকল্পের দলিল হস্তান্তর করেন–পিআইডি

বাংলাদেশে ফেসবুকের কান্ট্রি ম্যানেজার সাবহানাজ রশীদ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে সাবহানাজ রশীদকে। ৭ই সেপ্টেম্বর ফেসবুকের আঞ্চলিক সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরের এক ভার্চুয়াল বৈঠকে সাবহানাজের নিয়োগের এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। সাবহানাজ ফেসবুকের বাংলাদেশের সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখভাল করবেন। এর আগে তিনি বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনে কর্মরত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে থেকে পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন সাবহানাজ।

কুয়েতে বিচারক পদে আট নারী

কুয়েতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আট জন নারী। বিচারকের দায়িত্ব পালনে নারীদের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ৩রা সেপ্টেম্বর নিয়োগ পাওয়া নারীরা শপথ নেন। কুয়েতের সরকারি বার্তা সংস্থা কুনা (কেইউএনএ) জানায়, সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ৫৪ জনের মধ্যে এই আট নারী রয়েছে।

ফুটবলে নারীরাও পাবে পুরুষের সমান বেতন

ব্রাজিলের ফুটবলে দূর হয়েছে নারী-পুরুষের বৈষম্য। অন্তত বেতন-ভাতা বা পুরস্কারের অর্থের দিক থেকে মার্তা-ফরমিগা আর নেইমার-জেসুসদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য রইল না। ২রা সেপ্টেম্বর ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা দেয়, এখন থেকে তাদের পুরুষ ও নারী দলের সদস্যরা সমান বেতন-ভাতা পাবেন। অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে ও নিউজিল্যান্ডের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষ ফুটবলারদের সমান পুরস্কার ও বেতন দেওয়ার ঘোষণা দিল ব্রাজিল।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

আর্থিক সুবিধা পাবে বন্ধ কারখানার বেকার শ্রমিক

রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল শিল্প খাতে কাজ হারানো শ্রমিক এবং আংশিক বা পুরো বন্ধ থাকা কারখানাগুলোকে আর্থিক সুবিধা দিতে প্রায় ১ হাজার ১৩৩ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ চূড়ান্ত করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এই প্যাকেজটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং জার্মানির দেওয়া অনুদানের অর্থে বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্য তারা দিচ্ছে ১১ কোটি ৩০ লাখ ইউরো। এর মধ্যে ইইউ দিচ্ছে ৯ কোটি ৩০ লাখ, বাকি ২ কোটি ইউরো জার্মানির অনুদান। এই প্রণোদনা প্যাকেজটি বাস্তবায়ন হবে মূলত তৈরি পোশাক খাত, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য। কোভিড ১৯-এর কারণে ক্রয়াদেশ হারিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের যেসব কারখানা পুরো বা আংশিক বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা কারখানা লে-অফের কারণে এসব শিল্প খাতে কর্মরত যেসব শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন বা বেতন পাচ্ছেন না, তাদের সহায়তার জন্য এই প্যাকেজটি বাস্তবায়ন হবে। এরই মধ্যে শ্রম অধিদফতরের মাধ্যমে এ ধরনের কারখানা ও শ্রমিকদের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

করোনা ভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি কাটাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত এপ্রিলে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে শিল্পঋণের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ২০ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ ও কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, প্রি-শিপমেন্ট ঋণ ৫ হাজার কোটি টাকা, গরিব মানুষের নগদ সহায়তা ৭৬১ কোটি টাকা, অতিরিক্ত ৫০ লাখ পরিবারকে ১০ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার জন্য ৮৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের অনুরোধে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে প্রণোদনা প্যাকেজটির আর্থিক সুবিধা ও মেয়াদকাল একাধিকবার বাড়ানো হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা গৃহনির্মাণ ঋণ

মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সমস্যা সমাধানে সরকারের 'মুক্তিযোদ্ধা গৃহনির্মাণ ঋণ' প্রকল্পে অগ্রাধিকার পাবেন অসচ্ছল জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা। প্রস্তাবিত গৃহনির্মাণের জন্য নূন্যতম দুই শতাংশ নিষ্কণ্টক জমি আবেদনকারীর নিজের স্ত্রী বা স্বামীর দখলি স্বত্বে থাকতে হবে। আবেদনকারীরা ঋণ পাবেন ৫ শতাংশ সরল সুদে। ওই ঋণের সুদ সরকার কর্তৃক প্রদানকারী ব্যাংক বরাবর বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রদেয় হবে।

৯ই আগস্ট সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১২তম বৈঠকের কার্যপত্র থেকে

এ তথ্য জানা গেছে। বৈঠকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে বা বিনা সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। কমিটি তিনটি বৈঠক করে এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে।

জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা ঋণের আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো বয়সসীমা থাকবে না। মৃত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে তাঁর সম্মানী ভাতা পাওয়ার যোগ্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী সব উত্তরাধিকারের লিখিত সম্মতিক্রমে যথাযথ নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার সার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে দেশে সার নিয়ে কোনো সংকট নেই। ৬ই সেপ্টেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি'র

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকায় স্থানীয় একটি হোটেল থেকে অনলাইনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনের ৩৫তম সেশনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এ কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, শুরু থেকেই বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে। প্রথমেই সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত এবং কৃষকসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে এবং দেশ আজ দানাদার জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সভায় নিবিড় ও সম্প্রসারিত চাষাবাদের প্রয়োজনে চলমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাসায়নিক সারের চাহিদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে অতিরিক্ত ১ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া ও ২ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি সার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়েছে। চলমান অর্থবছরে ইউরিয়া ২৫ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, ডিএপি ১৫ লাখ মেট্রিক টন, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম প্রভৃতিসহ সকল রাসায়নিক সারের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ মেট্রিক টন।

করোনাকালেও খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকার দ্রুততার সাথে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করছে। ফলে এই পরিস্থিতিতেও খাদ্য উৎপাদনের ধারা বজায় আছে। আশা করা যায়, করোনার প্রভাবে দেশে খাদ্য নিয়ে কোনো সংকট হবে না। ৩রা সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ ও জুনোটিক (প্রাণিবাহিত) রোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'এক স্বাস্থ্য অ্যাপ্রোচ' নিতে হবে যেখানে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। এবারের ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক কনফারেন্সের আয়োজক ভুটান। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত হয় এ কনফারেন্স। কনফারেন্সের চেয়ারপারসন ভুটানের কৃষি ও বনমন্ত্রী লিওনপো ইয়েশি পেনজর, এফএও'র মহাসচিব ডংইয়ু কিউ, সদস্য দেশসমূহের কৃষিমন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪৬টি দেশ এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে।

ফসল ঋণ পেল ৯৮ ভাগ আবেদনকারী

করোনা পরিস্থিতিতে মন্দা মোকাবিলায় ফসলের ওপর স্বল্প সুদে যে ঋণের জন্য যারা আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে ৯৮ শতাংশ আবেদনকারীই ঋণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। সরকার এই ঋণ প্রণোদনা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কৃষক পর্যায়ে এ ঋণের সুদ ৪ শতাংশ। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তথ্য জমা দিলেই বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এক শতাংশ ভরতুকির অর্থ ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর ব্যাংকগুলো জানায়, করোনার সময়ে ফসলের ওপর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকা। আর উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৪৬ জন কৃষক ও কৃষি খামার। শুধু আগস্ট মাসে বিতরণ হয়েছে ২৭৬ কোটি টাকা এবং উপকৃত হয়েছে ৪৩ হাজার ২১২ জন কৃষক ও কৃষি ফার্ম। ফসল উৎপাদনের জন্য মোট এক লাখ ১২ হাজার ৪৫৯টি আবেদন ৩০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা হয়েছিল। আবেদন গৃহীত হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ১৭১টি। আবেদন গ্রহণের হার ৯৭ দশমিক ৯২।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

যমুনার তীরে বৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপিত

যমুনার তীরে পরিত্যক্ত জমিতে বসানো হয়েছে হাজার হাজার পাইল। এসব পাইলের ওপরই বসানো হয়েছে সোলার প্যানেল। ২৩ হাজার প্যানেল বসিয়ে উৎপন্ন হবে সাত দশমিক আট মেগাওয়াট সৌর

বিদ্যুৎ। বঙ্গবন্ধু সেতুর সিরাজগঞ্জ প্রান্তে নির্মাণ শেষের পথে থাকা কেন্দ্রটি আগামী ৪ঠা অক্টোবর গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করবে। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (এনডব্লিউপিজিসিএল) বলছে, যমুনা সেতুর পাশেই আরো ১০০ মেগাওয়াটের একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাদের জমি ইজারা দিতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এটি সরকারিভাবে নির্মিত সব থেকে বড়ো কেন্দ্র। যদিও এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার বেসরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে।

এনডব্লিউপিজিসিএল সূত্র জানায়, যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে আরো ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জমি নিয়েছে সরকার। এজন্য চীনের ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি)-এর সঙ্গে যৌথ কোম্পানি গঠন চুক্তি করা হয়েছে। সমান অংশীদারিত্বে এখানে আরো ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সেতু কর্তৃপক্ষের এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এখন বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় বিষয়টি অনুমোদন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। কেন্দ্রটি হলে এখানে আরো একটি মেগাপ্রকল্প গড়ে উঠবে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২২ দশমিক ৭৮ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রটি নির্মাণে ২০১৭ সালের ২৩শে নভেম্বর দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২০১৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কেন্দ্রটি স্থাপনে চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সই হয়। ২০১৯ সালের ৮ই মে থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়। সেই হিসেবে চলতি বছর ৭ই মে কেন্দ্রটির উৎপাদনে আসার সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু করোনার কারণে শ্রমিকরা কাজ করতে না পারায় সময় বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য দেশীয় অগ্রণী ব্যাংক থেকে প্রকল্প ব্যয়ের ৭০ শতাংশ ঋণ নেওয়া হয়। এনডব্লিউপিজিসিএল নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০ শতাংশ অর্থায়ন করেছে। এজন্য ১১ই ফেব্রুয়ারি অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে একটি ঋণ চুক্তি হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

শকুন সুরক্ষায় সরকারের কার্যক্রম

দেশে মাত্র ২৬০টি শকুন রয়েছে। এ অবস্থায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় শকুনের সংখ্যা বাড়াতে কাজ করছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী শকুনের অবদান অনস্বীকার্য। দিন দিন এই উপকারী পাখিটি হারিয়ে যাচ্ছে। বিলুপ্তপ্রায় শকুনকে বাঁচাতে গণসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার শকুন সংরক্ষণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৫ই সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস ২০২০' উপলক্ষে বন অধিদপ্তর আয়োজিত ওয়েবিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শকুন সংরক্ষণে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এক সময় দেশে শকুনের অভয়ারণ্য থাকলেও বর্তমানে প্রজাতিটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। শকুন বিলুপ্তির কারণ হিসেবে তারা গরুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের প্রতিক্রিয়াকে সামনে এনেছেন। শকুন সাধারণত মৃত গরুর মাংস খেয়েই বেঁচে থাকত। গ্রামের বটবৃক্ষের ডালে শকুনের বসবাস ছিল। তাদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে অনেকে শকুনের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৪ সালে দেশের দুটি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ১০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০২৫) বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের শকুন রক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো হিসেবে কাজ করছে। পরিবেশমন্ত্রী আরো বলেন, শকুনের আবাসস্থলের দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ ও শকুনের নিরাপদ এলাকার ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে শকুন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলগুলোর সহায়তায় মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে শকুনের প্রজননকালীন বাড়তি খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য হবিগঞ্জের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ও সুন্দরবনে দুটি ফিডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে অসুস্থ, আহত শকুন উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের সিংড়ায় একটি শকুন উদ্ধার ও পরিচর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ পর্যন্ত ৯৩টি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির শকুন উদ্ধার, পরিচর্চার পর পুনরায় প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ৭ম ও ৮ম আঞ্চলিক পরিচালনা কমিটির সভায় শকুন সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার শকুন সংরক্ষণের জন্য একটি মাইলফলক। সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে ২০১৪ সালে শকুনের প্রজনন সফলতা ছিল ৪৪ শতাংশ, যা ২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় গণপরিবহণে জরিমানা

চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন স্থানে গণপরিবহণে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। সরকারের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, ভাড়া তদারকি এবং গাড়ির কাগজপত্র যাচাই করে ত্রুটি পাওয়ায় এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৪৪টি মামলা দায়েরের পাশাপাশি ৪৩ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা করেছে কয়েকটি গণপরিবহণে। নগরের চান্দগাঁও, লালখান বাজার, টেকনিক্যাল মোড় এবং কাস্টম মোড়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর সকালে পরিচালিত এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সড়ক

পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুরে জামান চৌধুরী, লুৎফুর রহমান এবং শান্তনু কুমার দাশ। জানা যায়, ম্যাজিস্ট্রেট নুরে জামান চৌধুরী নগরের চান্দগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া, স্বাস্থ্যবিধি না মানা, যানবাহনের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১৫টি মামলায় ১৯ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা এবং চারটি গাড়ির লাইসেন্স জব্দ করা হয়। অপরদিকে ম্যাজিস্ট্রেট শান্তনু কুমার দাশ চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার এবং টেকনিক্যাল মোড়ে অভিযান চালিয়ে আইন লঙ্ঘনের দায়ে চারটি গাড়ির লাইসেন্স জব্দ এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানা, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ নানা অপরাধের দায়ে ১০টি মামলায় ১১ হাজার ৫০০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফুর রহমান নগরের কাস্টম মোড়ে অভিযান চালায়। এসময় তিনি আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি না মানা, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ নানা অপরাধে ১৯টি মামলায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

বাসে আগের ভাড়া কার্যকর

বাসের আগের ভাড়া ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। প্রতিটি বাস আসন অনুযায়ী যাত্রী বহন করতে পারবে। দাঁড়িয়ে যাত্রী বহন করা যাবে না। নতুন এসব সিদ্ধান্ত মনিটরিংয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই বড়ো চ্যালেঞ্জ মনে করছেন যাত্রী ও পরিবহণ সংশ্লিষ্টরা। এর আগে করোনার সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে ৬০ শতাংশ বাড়তি ভাড়া যোগ করে দুই সিটে একজন যাত্রী বহনের অনুমতি দেয় সরকার। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা জুন থেকে বাড়তি ৬০ শতাংশ ভাড়া আদায় করে আসছিল গণপরিবহণগুলো। কিন্তু ঈদুল আজহা থেকে বেশ কিছু বাস মালিক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আসন পূর্ণ করে যাত্রী বহন ও বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মালিক সমিতিও আগের ভাড়ায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

ফুটপাথে অবৈধ স্থাপনা থাকলেই নিলামে

ফুটপাথ ও সড়কে নির্মাণসামগ্রী, অবৈধ স্থাপনা পাওয়া গেলে তা নিলামে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মো. আতিকুর রহমান। ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে সংস্থাটির ১০টি জোনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাস্তাকে নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য ও দখলমুক্ত করতেই এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান মেয়র। রাস্তা দখল উচ্ছেদে নামার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দেন তিনি।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরির আবেদনে ৩০ পেরোনো প্রার্থীদের ৫ মাস ছাড়

করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে ৩০ বছর পেরিয়ে যাওয়া প্রার্থীদের সরকারি চাকরির আবেদনে পাঁচ মাসের বেশি সময় ছাড় দিয়েছে সরকার। ২৫শে মার্চ যাদের বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা আগস্ট পরবর্তী সময়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ পাবেন। করোনা মহামারিতে সাধারণ ছুটিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে স্থগিত ছিল সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া। অনেকেরই ৩০ বছর বয়স পেরিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি চাকরির আবেদনে সুযোগ শেষ হয়ে যায় তাদের। বয়স পেরিয়ে যাওয়া সেসব চাকরি প্রার্থীদের জন্য সুযোগ দিচ্ছে সরকার।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরকারি চাকরি প্রত্যাশীদের এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. ফরহাদ হোসেন ১৫ই সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২৬শে মার্চের পর মার্চ-আগস্ট পর্যন্ত যে সমস্ত মন্ত্রণালয় চাকরির জন্য তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দিতে পারেনি তারা আগস্টের পর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রার্থী যারা থাকবে তাদের জন্য আবেদনে চাইবে যে ২৫শে মার্চ তাদের বয়স ৩০ বছর হতে হবে। এটুকু দিলে তারা (চাকরি প্রত্যাশী) কনসেশনটা পেয়ে গেল।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শুধু যেহেতু কোভিড সিচুয়েশনের কারণে ওই সময়টায় ২৬শে মার্চ থেকে ছুটি শুরু হয়েছে, ২৫শে মার্চ বয়স ৩০ বছর হতে হবে। এটা আমরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে দেব। তাতে যাদের বয়স পার হয়ে গেছে তারাও আবেদনটা করতে পারবে।

তিনি আরো বলেন, সরকারি সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তরে যেখানে চাকরির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ছিল তাদের সবার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

'থ্রি সি' পরিহার করতে হবে

কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যেই যেসব দেশ লকডাউন তুলে নিয়ে প্রায় সবকিছু উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তাদের আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে 'থ্রি সি' থেকে দূরে থাকতে বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এই তিন সি হলো– 'ক্লোজড স্পেসেস' বা বন্ধ জায়গা, 'ক্রাউডেড প্লেসেস' বা জনবহুল জায়গা এবং 'ক্লোজ কন্ট্যাক্ট' বা বেশি কাছাকাছি থাকা। ১লা সেপ্টেম্বর ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস এক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকায় বিসিএসআইআর এর সভাকক্ষে জিনোমিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির কোভিড-১৯ এর জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের প্রতিবেদন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

করোনা ভাইরাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে চারটি উপায়ের কথা বলেছেন মহাপরিচালক। যেমন– বড়ো জমায়েত হয় এমন অনুষ্ঠান না করা, যে বয়স ও গ্রুপের মানুষ সহজে আক্রান্ত হয়, তাদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, মাস্ক পরা, নিয়মিত হাত ধোয়া ও তিন ফুট দূরত্ব থাকাসহ প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং টেস্ট ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ প্রতিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে সঙ্গনিরোধ নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া।

দেশে করোনা ভাইরাসটি দ্রুত রূপ পরিবর্তন করছে

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস অনেক দ্রুত গতিতে রূপ পরিবর্তন করছে। সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত ছয় ধরনের করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে, আর বাংলাদেশে চার ধরনের। করোনার স্পাইক প্রোটিনের পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রতিস্থাপন লক্ষ করা গেছে।

৬ই সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) জিনোসিম রিসার্চ ল্যাবরেটরির করোনা ভাইরাস নিয়ে করা গবেষণার এ ফলাফল তুলে ধরা হয়। বিসিএসআইআরের গবেষণায় এসেছে, বিশ্বে করোনা ভাইরাসের রূপান্তরের হার ৭.২৩ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে ভাইরাসটির রূপান্তরের হার ১২.৬০ শতাংশ। দেশে এ পর্যন্ত ৩২৫টি করোনা ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জীবন নকশা বের করা হয়েছে। এরমধ্যে বিসিএসআইআরের গবেষকরা ২৬৩টি পূর্ণাঙ্গ জীবন নকশা বের করেছেন। এই ২৬৩টি ভাইরাসের জিন পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, দেশের করোনা ভাইরাসগুলোর জিনোমিক পর্যায়ে ৭৩৭টি পয়েন্টে রূপান্তর (মিউটেশন) হয়েছে। অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যায়ে ৩৫৮টি নন-সিনোনিমাস অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিস্থাপন ঘটেছে। এছাড়া স্পাইক প্রোটিনের জিনে ১০৩টি নিওক্লিওটাইড রূপান্তরের মধ্যে ৫৩টি নন-সিনোনিমাস অ্যামিনো অ্যাসিডে প্রতিস্থাপন ঘটেছে। এর মধ্যে পাঁচটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র- যা বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস পালন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই সেপ্টেম্বর পালিত হয়েছে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি) ফিজিওথেরাপি বিভাগের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রামসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

সিআরপি সাভার কেন্দ্রসহ নয়টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৭০ হাজার রোগীকে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

আরো ১৯ জোড়া ট্রেন চলাচল শুরু

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কাটিয়ে ট্রেন চলাচল আবারো স্বাভাবিক হয়ে আসছে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে আরো ১৯ জোড়া আন্তঃনগর, লোকাল, কমিউটার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে তূর্ণা এক্সপ্রেসসহ বিভিন্ন রুটের মোট ৬৭ জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের উপপরিচালক (ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন) স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এসব তথ্য জানা যায়।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় ২৪শে মার্চ থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ায় সারা দেশের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় ৩১শে মে সীমিত আকারে ৮ জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল শুরু

হয়। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় দ্বিতীয় দফায় কর্তৃপক্ষ আরো ১১ জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ১৬ই আগস্ট নতুন করে আরো ১২ জোড়া আন্তঃনগর ট্রেন এবং এক জোড়া কমিউটার ট্রেন নতুন করে চালানোর কথা জানায় রেলপথ মন্ত্রণালয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭শে আগস্ট থেকে আরো ১৮ জোড়া ট্রেন চলাচল শুরু হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে আন্তঃনগর, কমিউটার ও লোকালসহ আরো ১৯ জোড়া ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। যেসব ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের মহানগর গোধূলী/প্রভাতী, ঢাকা-সিলেট-ঢাকা, রুটে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে উপবন এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে তূর্ণা এক্সপ্রেস, ঢাকা-মোহনগঞ্জ-ঢাকা রুটে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস, ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে জামালপুর এক্সপ্রেস, ঢাকা-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম-ঢাকা রুটে দ্রুতযান এক্সপ্রেস, রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী রুটে ধূমকেতু এক্সপ্রেস, ঢাকা-রংপুর-ঢাকা রুটে রংপুর এক্সপ্রেস, সিরাজগঞ্জ বাজার-ঢাকা-সিরাজগঞ্জ বাজার রুটে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস, খুলনা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে মহানন্দা এক্সপ্রেস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রহনপুর লোকাল, রহনপুর-খুলনা রুটে মহানন্দা এক্সপ্রেস, সান্তাহার-লালমনিরহাট-সান্তাহার রুটে পদ্মরাগ কমিউটার, খুলনা-গোয়ালন্দঘাট-খুলনা রুটে নকশিকাঁথা এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে সাগরিকা কমিউটার, ঢাকা-মোহনগঞ্জ-ঢাকা রুটে মহুয়া এক্সপ্রেস এবং খুলনা-বেনাপোল-খুলনা রুটে বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেন।

৫ মাস পর খুলনা-বেনাপোল ট্রেন চলাচল শুরু

মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবে দীর্ঘ পাঁচ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর শুরু হয়েছে খুলনা-বেনাপোল বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে সীমিত আকারে বেনাপোল-ঢাকা, খুলনা-চিলাহাটি, খুলনা-রাজশাহী ও খুলনা-ঢাকা ট্রেন চলাচল শুরু হয়। করোনার কারণে ২৪শে মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে যায় বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেন। পরে সারা দেশে লোকাল ট্রেনগুলো চালুর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ই সেপ্টেম্বর খুলনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসে বেনাপোলগামী বেতনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি। বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার সাইদুজ্জামান বলেন, আগে বেনাপোল-খুলনার মধ্যে বেতনা এক্সপ্রেস দিনে দু'বার চলাচল করত। এখন সীমিত আকারে দিনে একবার চলাচল করবে।

প্রতিবেদনঃ জাহিদ হোসেন নিপু

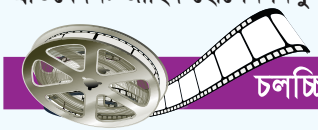

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রকাশ হলো *গাঙচিল* চলচ্চিত্রটির ফার্স্ট লুক

ফেরদৌস ও পূর্ণিমা অভিনীত *গাঙচিল* ছবিটির ফার্স্ট লুক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশ হলো। এটি পরিচালনা করছেন নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামূল। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের লেখা *গাঙচিল* উপন্যাস অবলম্বনে।

১লা সেপ্টেম্বর ছবিটির ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়। এরই মধ্যে

সেটি সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ছবিটি নিয়ে বেশ আশাবাদী এটির নির্মাতা কর্তৃপক্ষ ও কলাকুশলীরা।

গাঙচিল - এ চিত্রনায়ক ফেরদৌস অভিনয় করছেন সাংবাদিক চরিত্রে। চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা রয়েছেন একজন এনজিও কর্মীর ভূমিকায়। এছাড়া একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কলকাতার একসময়ের সুপারহিট নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আরো আছেন–আফজাল হোসেন, তারিক আনাম খান, আনিসুর রহমান মিলন, আহসানুল হক মিনুসহ অনেকে।

সরকার থেকে ৭০০ কোটি টাকা পাচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্প

চলচ্চিত্র শিল্প তথা সিনেমা হল বাঁচাতে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ২৫শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিনেমা হল বাঁচাতে বিশেষ তহবিল গঠনের ঘোষণা দেন। এরপর মাত্র ১০ দিনের মাথায় এই তহবিল গঠন করার খবর মিলল।

জানা যায়, ৭০০ কোটি টাকার যে বরাদ্দ দিতে যাচ্ছে সরকার, সেটি সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হবে যা খুবই স্বল্প সুদে ও দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন হল মালিকরা।

বুসানে বাংলাদেশি দুই চলচ্চিত্র

তারিক আনাম খান ও নিমা রহমানের ছেলে আরিক আনাম খানের নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *ট্রানজিট*-এর প্রিমিয়ার হতে যাচ্ছে ২৫তম বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ছবিটি এশিয়ান স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনীত হয়েছে। পাশাপাশি বুসানের উইন্ডো অন এশিয়ান সিনেমায় থাকছে বাংলাদেশের রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের *নোনাজলের কাব্য*। উৎসবটি চলবে ২১ থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত। *ট্রানজিট* চলচ্চিত্রটিতে ঢাকা শহরের একজন সাধারণ সংগ্রামী মানুষের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এর মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়াও আছেন শারমীন আঁখি, বৈদ্যনাথ সাহা, খায়রুল আলম টিপু, শরিফ হোসেনসহ অনেকেই। *নোনাজলের কাব্য* রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের প্রথম সিনেমা। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লেখা ও সরেজমিন গবেষণা চলে পাঁচ বছর আগে। *নোনাজলের কাব্য* ছবিতে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, তাসনুভা তামান্না, শতাব্দী ওয়াদুদ, অশোক ব্যাপারী, আমিনুর রহমান মুকুলসহ অনেকে। বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ প্রযোজনার ছবি এটি।

সৈকতের ডকুফিল্ম *সম্মান*

সমাজ সচেতনমূলক একটি বিশেষ বক্তব্যের ওপর নির্মিত হলো ডকুফিল্ম *সম্মান*। জি এম স্পর্শের রচনায় ফিল্মটি নির্মাণ করছেন নাট্যনির্মাতা জি এম সৈকত। এতে অভিনয় করেছেন শিশির

আহমেদ, শারমিন বৃষ্টি, শিশু শিল্পী প্রকৃতি, শিমুল, দিপু ও অল্পা সুহি। নির্মাতা সৈতক জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদে দেওয়া বক্তব্যের মাঝে ফুটে উঠেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে গরিব-দুঃখী মানুষকে সম্মান করতে বলেছেন সেটি। মূলত এই বক্তব্যকে ঘিরে ডকুফিল্মটি নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। শিগগিরই ইউটিউব চ্যানেল প্রকৃতিতে দর্শকরা দেখতে পারবেন *সম্মান*। বৃষ্টি বলেন, একটি বক্তব্য প্রধান ও মানসম্মত ডকুফিল্মে অভিনয় করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আশা করছি দর্শকরা এটি ভালোভাবেই উপভোগ করবেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

চিত্রশালায় 'মুক্তির মহানায়ক'

রংতুলির আঁচড়ে উদ্ভাসিত হয়েছে জাতির পিতার মুখচ্ছবি। উপস্থাপিত হয়েছে অবিসংবাদিত নেতার জীবনের নানা অধ্যায়। চিত্রকর্মগুলো আঁকা হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু: জীবন থেকে চিত্রপটে' শীর্ষক একটি আর্ট ক্যাম্পে। বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* অবলম্বনে ১০০ শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর্ট ক্যাম্পটি। শত চিত্রকর্মের সেই শিল্পসম্ভার এখন প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায়। চিত্রকর্ম ও আলোকচিত্রে সজ্জিত প্রদর্শনীটির শিরোনাম 'মুক্তির মহানায়ক'। চিত্রশালার ১ ও ২নং গ্যালারিতে চলছে এই শিল্পায়োজন। করোনা মহামারির কারণে শিল্প রসিকরা মূলত ভার্চুয়াল মাধ্যমে অবলোকন করছেন এই প্রদর্শনী। www.shilpakala.gov.bd এই ঠিকানায় দর্শকরা দেখতে পারছেন এ প্রদর্শনী। কেউ চাইলে অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে সরাসরিও দেখার সুযোগ পাচ্ছেন শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রদর্শনীটি। মুজিববর্ষ ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর পরিচালনায় এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলা

'যত বই তত প্রাণ'–স্লোগানে ১৮ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ২৯তম নিউইর্য়ক বাংলা বইমেলা। করোনা মহামারির জন্য মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত দশ দিনব্যাপী বইমেলাটি এবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল বাঙালি লেখকবৃন্দ প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলা একাডেমিসহ বাংলাদেশের ২১টি ও পশ্চিমবঙ্গের ৪টি প্রকাশনা অংশগ্রহণ করে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারো বইমেলাটি উৎসর্গ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ৮ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ের অনলাইনে এই বইমেলায় www.nyboimela.org ওয়েবসাইটটি উদ্‌বোধন করা হয়। ওয়েবসাইটের অনলাইন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে. এম খালিদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ইমেরিটার্স অধ্যাপক ড. জিয়া উদ্দীন আহমেদ। ১৮ই সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে বাংলা বইমেলাটি চলে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আজীবন সম্মাননায় সাবিনা ইয়াসমিন

সংগীতের বিভিন্ন শাখায় ২০১৯ সালের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বাংলাদেশ মিউজিক জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন

(বিএমজেএ)। ১৩ই সেপ্টেম্বর বিএমজেএ তাদের ফেসবুকে পেইজে এ ঘোষণা দেয়। করোনার কারণে এ বছর অনলাইনে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ বছরের বিএমজেএ 'মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০১৯'-এ আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন। সেরা সংগীত শিল্পী আসিফ আকবর, সেরা গীতিকার আসিফ ইকবালসহ অনেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। বিএমজেএ সূত্রে জানা যায়, মার্চের শেষে এ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে পিছিয়ে যায়। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় ভার্চুয়ালভাবেই সপ্তম বিএমজেএ 'মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' ঘোষণা ও স্বাধ্যবিধি মেনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষানীতিতে যুক্ত হবে ই-লার্নিং

করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতিতে যুক্ত হতে যাচ্ছে অনলাইন শিক্ষা বা ই-লানিং কার্যক্রম। ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসি আই) আয়োজিত 'ই-লার্নিং শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সরকারের এ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোভিড মহামারি একটি বৈশ্বিক সংকট। এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থবির করে দিয়েছে। তবে প্রতিটি সংকটই সম্ভাবনার নতুন দিক উন্মোচন করে। কোভিড-১৯ মহামারি শিক্ষাব্যবস্থায় ই-লার্নিং ব্যবহার বাড়ানোর পথ উন্মোচন করেছে। শিক্ষানীতি ২০১০ যুগোপযোগীকরণ এবং সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ই-লার্নিং-এর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সারে-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ওসামা খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, এদেশের মানুষ অত্যন্ত প্রযুক্তিবান্ধব বিশেষ করে শিক্ষা কার্যক্রমে ই-লার্নিং-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে আমাদের যুব বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে না। সামনের দিনগুলোতে ক্লাসরুমে সরাসরি শিক্ষাদানের পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে ই-লানিং চালু রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ টাকায় পুরো মাসের ইন্টারনেট

করোনাকালে ১০০ টাকা রিচার্জে পুরো মাসের ইন্টারনেট পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। টেলিটক নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের বিডিবেন প্ল্যাটফর্মের আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ সুবিধা পাবেন। ২রা সেপ্টেম্বর ইউজিসি'র সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ইউজিসি জানায়, শিক্ষার্থীরা যাতে বিনামূল্যে অনলাইন এডুকেশন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারেন সেলক্ষ্যে বিডিবেন ২১শে জুলাই টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড সব মোবাইল অপারেটরকে পত্র পাঠায়। বিডিবেনের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে টেলিটক ২৮শে আগস্ট সম্মতিপত্র দিয়েছে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

মাদককে 'না' বলো

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকে সম্পৃক্ত পুলিশ সদস্যদের কোথাও জায়গা হবে না

মাদক সেবন ও মাদক ব্যাবসায় সম্পৃক্ত পুলিশ সদস্যদের কাঠোর বার্তা দিয়েছেন রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) নতুন কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক। তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকা

হওয়ায় রাজশাহীতে মাদকের প্রবণতা বেশি। তাই এ ইস্যুতে আরএমপি'র জিরো টলারেন্স নীতি। আমরা পুলিশ সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে তাদের সতর্ক করেছি। পুলিশের পোশাক পরে মাদক ব্যাবসা ও মাদক সেবন কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসবে তাদের পুলিশের কোথায়ও জায়গা হবে না। ১২ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন আরএমপি কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক।

নতুন মাদক অ্যামফিটামিন

ইয়াবার চেয়ে শক্তিশালী মাদক অ্যামফিটামিন। হযরত

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর এভিয়েশন সিকিউরিটিদের সহযোগিতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস কোকেন সদৃশ নতুন ধরনের মাদকদ্রব্য জব্দ করে। তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে সাড়ে ১৫ কেজি অ্যামফিটামিন মাদকগুলো পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয় এটি একটি প্রথম শ্রেণির মাদক। মূলত ইয়াবা তৈরির উপাদান দিয়ে কোকেন সদৃশ এই মাদক উৎপাদন করা হয়।

রংপুরে এক বছরে মাদকবিরোধী অভিযানে কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

এক বছরে মাদকবিরোধী অভিযানে প্রায় এক কোটি ১০ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগ (আরপিএমপি)। এর বিপরীতে মামলা হয়েছে ৬৪১টি। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ইয়াবা, গাজা, হিরোইন, ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, স্প্রিট, ওয়াস ও চোলাই মদ রয়েছে। এসব মাদকদ্রব্য গত বছরের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে উদ্ধার হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর এসব তথ্য নিশ্চিত করেন আরপিএমপি'র অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) শহিদুল্লাহ্ কাওছার।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য কারাম উৎসব

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার নাটশাল ও বকাপুর গ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওঁরাও, মুণ্ডা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন 'ডাল পূজাকে' কেন্দ্র করে কারাম উৎসব পালন করেছে। ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এ উৎসব পালিত হয়। বিকেলে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে নাটশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কারাম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর ভাদ্র মাসে এর তিথি আসে। কারাম একটি গাছের নাম। যাকে আমরা খিল কদম নামে চিনি। নৃগোষ্ঠীদের মতে পবিত্র গাছটি তাদের মঙ্গলের প্রতীক। বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে বিকেল ৪টায় মেলার উদ্‌বোধন করেন জাতীয়

আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। উদ্‌বোধন শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নওগাঁর মহাদেবপুর, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও ধামইরহাট উপজেলা ছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা থেকে আসা বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন মেলায় অংশ নেয়। করোনার কারণে এবার সীমিত পরিসরে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আগের বছরগুলোতে ৩০-৪০টি সাংস্কৃতিক দল একসঙ্গে নাটশাল মাঠে নাচ-গান পরিবেশন করত। নাচে-গানে ও ঢোল-মাদলের আওয়াজে মাতোয়ারা হয় নাটশাল মাঠ। সাংস্কৃতিক পর্ব শেষে আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। নাটশাল কারাম মন্দিরের পুরোহিত কার্তিক ওঁরাওয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মহাদেবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আতাউল হক সিদ্দিকী।

স্ট্রিট লাইটের সুফল পাচ্ছে পার্বতীপুরবাসী

'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'–এ স্লোগানকে বাস্তবায়নের পর এবার রাতের আঁধার ঘুঁচতে সৌর বিদ্যুৎ সংযুক্ত উচ্চ ক্ষমতার লাইট সম্বলিত আলোর খুঁটি স্থাপনের বিষয়টি বেশ সাড়া ফেলেছে জনমনে। সেন্সর যুক্ত থাকায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে চালু হওয়ার পাশাপাশি ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এসব লাইট। শুধু তাই নয়, এসব খুঁটির নিকট মানুষ কিংবা যানবাহন কাছাকাছি নির্দিষ্ট দূরত্বে যাওয়া মাত্রই সেন্সরের কারণে লাইটের আলো বৃদ্ধি ঘটে। ফলে চুরি, ডাকাতির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এখন শূন্যের কোঠায় নেমেছে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীরা পেল হুইল চেয়ার, স্মার্ট সাদাছড়ি ও হিয়ারিং এইড

ঝিনাইদহ জেলায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ৩১শে আগস্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে এসব উপকরণ

বিতরণ করেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। শহরের বিভিন্ন এলাকার ১০ জন প্রতিবন্ধীকে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে হুইল চেয়ার, স্মার্ট সাদাছড়ি ও হিয়ারিং এইড বিতরণ করা হয়।

হুইল চেয়ার পেল ১৫০ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বরিশাল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫০

জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে। ২৪শে আগস্ট জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার তুলে দেন। জেলা প্রশাসন বরিশালের আয়োজনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এসময় জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান বলেন, প্রতিবন্ধীরা আমাদের পরিবারের একটি অংশ। তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফুটবলার উন্নতি খাতুনের হাতে চেক তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল

প্রতিবন্ধীদের জন্য স্টেডিয়াম হবে

বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত স্টেডিয়াম রয়েছে। বাংলাদেশেও ঢাকার অদূরে সাভারে দেশের প্রথম প্রতিবন্ধী স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। বিভিন্ন এলাকায় শিশুপল্লি স্থাপনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো দ্রুতই একনেকে পাঠানো হবে। ১৭ই আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা এখন ১০০ উপজেলায় শতভাগ প্রতিবন্ধী, দুস্থ, নিম্ন আয়ের মানুষ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা দেব। সারা দেশে হতদরিদ্র ও গরিব মেধাবী ছাত্রদের সহযোগিতার জন্য কাজ করছি।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

দুটি আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি শিগগিরই শুরু

বঙ্গবন্ধু অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা আগামী ২১-৩০শে জানুয়ারি। যুব বিশ্বকাপের এটি বাছাইপর্ব হওয়ায় ১০ দেশের এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব রয়েছে। এদিকে ১১-১৯ মার্চ হওয়ার কথা এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যেখানে প্রথম খেলবে বাংলাদেশ। ঢাকায় এই দুটি টুর্নামেন্টকে ঘিরে শিগগিরই প্রস্তুতি শুরু করতে চায় হকি ফেডারেশন। ৭ই সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, 'ঘরের মাঠে দুটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টকে ঘিরে আমরা শিগগিরই অনুশীলন শুরু করব।' দুটি টুর্নামেন্টই অনুষ্ঠিত হবে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে।

করোনা কাপ রাগবিতে সেনাবাহিনী চ্যাম্পিয়ন

মুখে মাস্ক। মাথায় ওটি ক্যাপ। থার্মাল স্ক্যানার কপালে ধরে প্রত্যেকের গায়ের তাপমাত্রা মাপেন মনোয়ারা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরপর ৮ই সেপ্টেম্বর শুরু হয় খেলা। পল্টন আউটার স্টেডিয়ামে দিনভর চলে করোনা কাপ রাগবি।

চার দলের খেলোয়াড়রা স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা কাপ রাগবি টুর্নামেন্টে খেলেছেন। লিগভিত্তিক খেলায় সেনাবাহিনী ১৩১ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলাদেশ আনসার ৮১ পয়েন্ট পেয়ে রানার্সআপ হয়।

বার্সার অনুশীলনে ফিরলেন মেসি

বার্সেলোনার সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর ৭ই সেপ্টেম্বর প্রথম অনুশীলনে যোগ দিলেন লিওনেল মেসি। কাতালানদের নতুন ডাচ কোচ রোনাল্ড কোমানের অধীনে প্রথম অনুশীলন করতে গিয়ে মেসি দেড় ঘণ্টা আগে আসেন। অনুশীলন দেখতে বার্সার সমর্থকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ২০২০-২০২১ মৌসুমের জন্য ক্লাবের তৃতীয় জার্সি উন্মোচন করেছে বার্সেলোনা। গোলাপি রঙের জার্সি সবার মনে ধরেছে।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সাহায্য উন্নতি খাতুনকে

অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলের সদস্য উন্নতি খাতুন। সর্বশেষ বঙ্গমাতা অনুর্ধ্ব-১৭ জাতীয় ফুটবলে তিনি হয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং সেরা খেলোয়াড়। এই ফুটবলারের মা ক্যানসারে আক্রান্ত। মায়ের চিকিৎসায় খাতুনের পরিবারের অনেক টাকা খরচ হয়েছে। দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে। এখন এই ফুটবলারের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নতি খাতুনকে ৫ লাখ টাকা দিয়েছেন তিনি। ১৫ই সেপ্টেম্বর এই ফুটবলারের হাতে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া টাকার চেক তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী

আফরোজা রুমা

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৫ই সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার মদনেরগাঁও গ্রামে জন্ম হয় আবু ওসমান চৌধুরীর। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন পান তিনি। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি পদোন্নতি পেয়ে মেজর হন। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে যখন ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়, সেই খবর আবু ওসমান চৌধুরী পান কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে বসে। সেসময় তিনি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের চতুর্থ উইংয়ের কমান্ডার হিসেবে চুয়াডাঙ্গার দায়িত্বে ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি কুষ্টিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছান এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদল সৈনিক নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলে আবু ওসমান চৌধুরী এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদকে গার্ড অব অনার দেন। তাঁর স্ত্রী নাজিয়া খানমও সেসময় রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে খাবার ও পানীয়, টাকাপয়সা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রয়োজনে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাহারা দেওয়ার মতো কাজ করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবু ওসমান চৌধুরীকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়, বঙ্গবন্ধু তাঁকে আর্মি সার্ভিস কোরের (এএসসি) পরিচালকের দায়িত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সেনা অভ্যুত্থানের সময় একদল সেনাসদস্য আবু ওসমান চৌধুরীকে হত্যার জন্য তাঁর গুলশানের বাড়িতে হামলা করে। বাড়িতে না থাকায় তিনি সেদিন প্রাণে বেঁচে গেলেও নিহত হন তাঁর স্ত্রী নাজিয়া খানম।

পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আবু ওসমান চৌধুরী। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যানের পদেও ছিলেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে আবু ওসমান চৌধুরীকে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন- বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান করা হয়। পরে তাঁকে চাঁদপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৪ সালে আবু ওসমান চৌধুরীকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে সরকার।

সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আরো শোক জানিয়েছেন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ৫ই সেপ্টেম্বর বাদ আসর ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জের পাশে সেন্ট্রাল মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে বনানী সামরিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 04, October 2020, Tk. 25.00

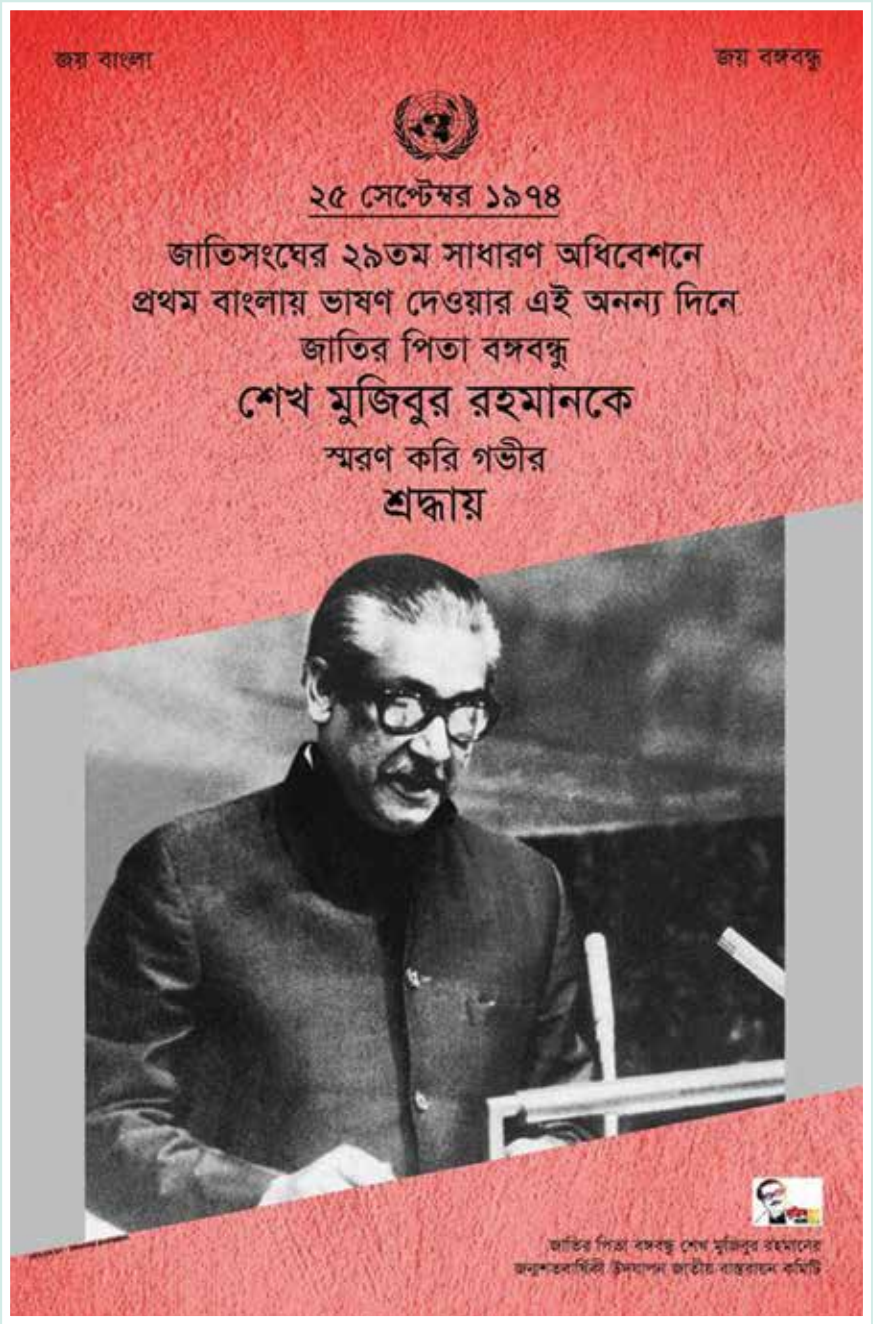

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd